দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে নতুন প্রবণতা, সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও আধিপত্য বাদের প্রতিস্পর্ধী চেতনার ক্রমবিকাশ, ছোটগল্পের বয়ানে স্বর ও স্বরান্তর, সময়ের দলিলী করণ ও মহাশ্বেতার নান্দনিক প্রতীতি

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতধরেসার্থক বাংলা ছোটগল্পের প্রজন্ম ঘটলেও পাশ্চাত্যের দেশ গুলিতে ছোটগল্প আরও অনেক আগেই মুক্তিলাভ করেছে। তবে এই সময়ে দাঁড়িয়ে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আজ প্রায় পুরোপুরি পরিবর্তিত। শুধুমাত্র আকারটিকে গ্রহণ করে বাকি সব বদলে যেতে যেতে ছোটগল্প আজ হয়ে উঠেছে নতুন আরো এক স্বতন্ত্র ধারার পথিক।ছোটগল্পে গল্পের আদল থাকলেও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গুলো হয়েছে পরিবর্তিত। আবার অনেকের গল্পেই গল্পহীনতাও পরিলক্ষিত হয়। তাই সময়ের চিহ্নকে বহন করে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় ছোটগল্পের স্বরূপ ক্রমাগতই নতুন পথের অভিযাত্রী হয়েছে। তবে সব পরিবর্তনেরই একটা সূচনা থাকে, থাকে ধারাবাহিকতার পরম্পরা। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। তাই শুরু থেকে কীভাবে নানা পরিবর্তন পরিশীলনের মধ্যদিয়ে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তিত রূপটি নির্মিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা য়েতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ছোটগল্পের সংজ্ঞা তাঁর সমসাময়িক সময় এবং পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য ছিল। সে সময় বাংলা ছোটগল্প মানেই রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করে গল্প রচনা।রবীন্দ্রনাথ‘সোনার তরী’কাব্যগ্রন্থের ‘বর্ষাযাপন’কবিতায় ছোটগল্পের মূল স্বরূপকে বর্ণনা করেছেন এভাবে,

“ছোটপ্রান ছোটব্যাথা ছোট ছোট দু:খ কথা

নিতান্তই সহজ সরল।

সহস্র বিস্মৃত রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইলো না শেষ।”[১]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছোটগল্প প্রসঙ্গে এই উক্তি গুলি করেছেন,বাধরাহয়েথাকেছোটগল্পেরসংজ্ঞা হিসেবেঅথচ নিজেই ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে নিজের বলা কথা কে পেরিয়ে গেছেন। নিজেই নিজের দেওয়া সংজ্ঞাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নতুন এক কাঠামো নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথেরই রচিত ‘দেনাপাওনা’গল্পের কথা। গল্পেবিষয়গতদিকথেকেনিরুপমার বাবা পনের টাকা দিতে না পারায় নিরুপমার বিবাহের পরও সংসার বিনষ্ট হয়ে যায়। সহ্য করতে হয় অ:সহনীয় অন্যায়-অত্যাচার এবং পরিশেষে মৃত্যু বরণ করতে হয় নিরুপমাকে। গল্পের এক দিকে রয়েছে অসহায় গরীব পিতার সামর্থ্যেরও অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আবার অন্যদিকে রয়েছে কন্যার সুখের জন্য বেশি টাকা পণ দিয়ে ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে পরিমান টাকা বিয়ের পণ হিসেবে দেওয়ার কথা সে পরিমান টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় চরম অপমান সহ্য করতে হয়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মানবিকতাকে হীন করা হয় কন্যাসন্তানকে জন্ম দেওয়ার জন্য। আবার মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহন করার জন্য নিরুপমা যেন বড় ধরনের অপরাধী। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিরুপমার করুণ পরিণতির মধ্যদিয়ে গোটা ভারতবর্ষের নারীর প্রকৃত স্থানকে চিহ্নিত করেছেন। তবে লক্ষণীয় যে নিরুপমার প্রাণটি মোটেও ক্ষুদ্র নয়, আবার নিরুপমার দু:খ শুধুমাত্র নিরুপমারই নয় পাশাপাশি সমস্ত ভারতীয় নারীরই দু:খ, আর একারণেই আমরা নিরুপমার ব্যথাকে নিতান্তই ছোট ভাবতে পারিনা।আবার তাঁরই রচিত ‘পোস্টমাস্টার’গল্পের রতনের প্রাণকেও ছোট বলতে পারিনা। কেননা গল্পকার রতনের মধ্যদিয়েশুধুমাত্র রতনকেই নয় গোটাবিশ্বেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বয়:সন্ধির দ্বন্দময়তাকে তুলে ধরেছেন। আবার বিষয়গত দিক থেকে তাঁর জীবন সায়াহ্নে রচিত ‘তিনসঙ্গী’ গল্প গ্রন্থের কথা উল্লেখ করতে হয়। যেখানে তিনি বিষয়গত উপস্থাপনাতেই নয় শুধু, প্রকরণগত দিক থেকেও

আধুনিকতার গোত্র লক্ষ্মনকে প্রকাশ করেছেন তাঁর এতদিনকার ছককে ভেঙে দিয়ে। আয়তনের দিক থেকে তো 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের সীমানাকে আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। এভাবেইসময়ের নির্মান প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ছোটগল্প ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং বর্তমানের নিজস্ব আকার ধারণ করে।

রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত গল্পকার হিসেবে উঠে আসে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজ শেখর বসু, জগদীশ গুপ্ত, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রমথ নাথ বিশী, অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রবোধ কুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশাপূর্ণা দেবী, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ মিত্র, প্রভৃতি গল্পকারের নাম। তাঁরা সমসাময়িক সময়ের দাবীকে স্বতন্ত্র ধারায় এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজেদের গল্পে প্রকাশ করেন। এঁদের গল্পেও প্রেম-প্রকৃতি, অভাব-অনটন, বেকারত্ব, শোষণ, নির্যাতন এবং সর্বোপরি নারী পুরুষের সম্পর্কের নানা দিক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রোত্তর চল্লিশের বাংলা ছোটগল্প বলতে যে সময়ের ব্যাপ্তিকে আমরা ধরে নিই, তাতে যুদ্ধ কালিন অরাজকতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগের কলঙ্ক নিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং এর ফলে বাস্তুহারাদের উৎক্রান্তিময় অবস্থা এই সবই রাজনৈতিক তথা সামাজিক অন্তর্বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে। সময়ের হিসেবে দশক ধরে এই পরিবর্তনের রূপকে একরকমভাবে দেখানো যেতে পারে। আবার 'পত্রিকা বা মুখপত্র'ভিত্তিক সাহিত্যিক আন্দোলনে ছোটগল্পের বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকগত যে পরিবর্তন তা রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পের পরিবর্তিত চেহারারই অভিমুখ, যদিও রবীন্দ্রনাথের সময়েই আবার অনেক বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটেছিল। যেগুলো আমরা রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরোধিতা বলেজানি। অবশ্য কল্লোল যুগের লেখকেরা প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্র বিরোধী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন। এবং অনেকে রবীন্দ্র ভাবধারা থেকে বেরোতে পারেননি বরং রবীন্দ্রনাথেরউপরেই পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পরেন এবং রবীন্দ্র নাথের ঋণকে স্বীকার করেন।

পঞ্চাশের দশকের শেষে এবং ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পের প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে একদল গল্পকার কে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করতে দেখা দেখা যায়। এই ধারার লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন, অজয় দাস গুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতিনন্দী, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য, রতন ভট্টাচার্য, শংকর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য ও স্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। এদের নেতৃত্ব হিসেবে উঠে আসে বরিষ্ঠ লেখক বিমল করের নাম। তিনি 'এই দশকের গল্প' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। মূলত এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল ছোটগল্পে নতুন রীতির প্রচলন করা। এই নতুন রীতি বলতে বোঝানো হচ্ছে ছোটগল্পের বিষয় ও ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্বের প্রসার ঘটিয়ে ছোটগল্পের আত্মিক মুক্তির প্রয়াস। এঁদের মূল বক্তব্য ছিল,

> "ছোটগল্পকে ছোট এবং গল্প হতে হবেএই চলতি ধারনারআমরা শরিক নই। সাহিত্যগত যে তত্ত্ব তাতে অবশ্য ছোটগল্পকেবলা হয়েছে পাঠক যা এক দফায় (ইংরেজিতে যাকে বলেছে ইনওয়ানসিটিং) পড়ে ফেলতে পারে। ..... আসলে এই ছোট বড়র হিসেবঅর্থহীন। অনেক গল্প আছে যা গল্প কথায় সংক্ষিপ্ত করার নয়। আর এমনও গল্প আছে শব্দের ব্যায় সঙ্কোচে সার্থক হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য আমরা ছোটগল্পের 'ছোট' কথাটির নির্দিষ্টকোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অপারাগ। যখন মনে করি, কোনো লেখা সম্পর্কেইচূড়ান্ত কোন তত্ত্ব সম্ভব নয়।"[২]

এই আন্দোলনের পুরোধা বিমল কর জানান,

> "আমরা আমাদের মন মতো করে গল্প লিখতে চাই যে লেখা সাধারণ চলতি পত্রিকা গুলির পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়। বস্তুত এই কারণেইআমাদের এই গ্রন্থমালা। যার পাঠক স্বল্প, সহানুভূতিশীল এবংপরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। .....তাঁরা তাদের রুচি ইচ্ছা এবংমর্জিতে বিশ্বাস রেখে লিখবেন, অন্তত এই গ্রন্থমালার গল্প আর তাতেযত অল্প পাঠকই জুটুক যায় আসে না।"[৩]

ছোটগল্পের নতুন রীতি প্রয়োগের পুরোধা বিমল করের বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট যে এদের মূল উদ্দেশ্য হল,-গল্পের মূল অর্থের অনুসন্ধান। যথা, ছোটগল্প কী নিছক গল্প, না আরও কিছু?তা কি বাহিরজগতের ঘটনা বিবরণ না ভিতর জগতের মনন?ছোটগল্পে গল্প কই?এই আন্দোলন নতুন রীতির ঝোক মাত্র, না আত্ম আবিষ্কার?এই প্রসঙ্গে বিমল কর নিজেই মন্তব্য করেছেন,

> "সাম্প্রতিক কালের ষোলজন তরুন লেখক কে নিয়ে এই গ্রন্থ। তারা সকলেই প্রায় এই দশকের মধ্য সময় থেকে। লিখতে শুরু করেছেন। অতি অল্প সময়েএদের সাহিত্য প্রচলিত ধারাকে অতিক্রমকরে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তাই আঙ্গিক রীতি বক্তব্য ওবৈশিষ্ট্যের ভিন্নতর স্বাদের জন্য এই সংকলন অবশ্যই গল্প পাঠকেরকাছে প্রিয় হবে।"[৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাংলা ছোটগল্পের ধারা পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিমল কর আরও বলেন,

> "....বাংলা ছোটগল্পের চল্লিশ এবং পঞ্চাশের পূর্বসূরীদের আনুগত্যস্বীকার করেও তাদের রচনায় ভিন্ন প্রকৃতি ও স্বাদ যোগ করতেপেরেছিলেন। বস্তুত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা

> এবং প্রভাব অধিকতর গভীরভাবে আমাদের সমাজ এবং জীবনে স্থায়ী হয়েছিল।.....বাংলা ছোটগল্পে জীবন চিত্র অনেক বেশি আন্তরিক, জীবন সমস্যা অনেক বেশি প্রকট এবং মানুষের আত্মিক প্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবীহয়ে উঠেছে। তাই একথা স্পষ্ট যে এই আন্দোলন গল্পের টান বা যাদু মেষ কথা নয়। পরিবর্তে গল্পের মধ্যে মনন, তীব্র-তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবন জিজ্ঞাসার প্রাধান্য। এই কারণেই এই পর্বের গল্প হয়ে উঠেছে অস্থির জীবন, ধর্মবোধ ও নিয়তির রহস্য সন্ধানেব্যাকুল, ...বিষণ্নতা, মানুষের অন্তরের জটিলতা, অন্তর ও বাইরের সূত্রসম্বন্ধেঘনিষ্ঠতা, স্বপ্নে ও চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ, নি:সঙ্গ অন্তর্জীবনের বেদনা ও অসহায়তা বোধে, আত্ম আবিষ্কারের এক শুদ্ধ প্রয়াস। আধুনিকতার জন্ম এই বোধে।”[৫]

তবে বাংলা ছোটগল্পে বিমল করের নেতৃত্বে যে আন্দোলন দেখা দেয় সেই আন্দোলন প্রসঙ্গে বহু সমসাময়িক গল্পকার ও প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অনেকেই অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন নীচে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করার চেষ্টা করা হল,

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> “ধারা বদলের কিংবা নতুন একটি রীতির প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেইযে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্মআবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকরা কেউইচাননি বাংলা গল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চনা করতেবিদ্রোহ তাদের কারোরই অভিপ্রেত ছিল না বোধয়। তবু তারা পুরনো রীতি প্রকরণ,

বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন। বহির্মুখিনতার চেয়ে তাদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাদের লেখায় স্বকৃত আত্ম প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিলবারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনা মগ্নভাব প্রবাহে তীর্যক কিংবা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলসমাজ এবং বাস্তবের খন্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরেঅতি জটিল সূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রথিত হয় স্বপ্নেএবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে।”[৬]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে,

“গল্প শুধু এই বিন্যাসের সামঞ্জস্যের দোষে প্রমিত সংস্থাপনারঅভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। গল্পের আর সব উপাদান পেলেই আমরা রচনায় প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আকার সম্বন্ধে আমাদেরকোন পরিমান জ্ঞান থাকেনা। পরিমান জানলেই চলেনা, পরিমান সম্বন্ধেও সচেতন হওয়া দরকার, গল্পের ধর্মনাশহয় শুধু অসংযমে বা রস দ্বৈধে নয়, বেশির ভাগ হয় এই কেন্দ্র চ্যুতিতে। তাই রস সমগ্রতার জন্য চাই যথার্থ আঙ্গিক, লিখন শৈলী, পর্যাপ্ত সমীচীন ভাষা। শিল্পে রূপ না হলে রসহয় না। এই রস স্ফুর্তির জন্যই রূপ দক্ষতার প্রয়োজন। সৌষ্ঠব না থাকলে ঐশ্বর্যকে ধরবে কেমন করে?”[৭]

সাহিত্য ঐশ্বর্যের স্বপ্রকাশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক বিখ্যাত প্রাবন্ধিক জানান, -

“সাহিত্যের বিচার হবে প্রথমত সমকালীন কষ্ঠিতে, এবংতাতে উত্তীর্ণ হলে ভবিষ্যত স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা

সেটাপরে বিবেচ্য। আধুনিক সাহিত্যের বিষয় মানুষ নয়, মানুষের যন্ত্রনা নয়, কারণ অস্থি নয়, অস্তিত্ব, বোধ নয়, বোধে। ....এই দ্বন্দ্বে ও অসহযোগে ব্যক্তিই প্রথম এবং শেষকারণ সে জেনেছে যে মধ্য পথেই যাত্রার সমাপ্তি হয়েছে, সঙ্কল্প অভীক্ষা পর্যন্ত যেতে পারব না, এমনকি পশ্চাৎপশরণের পথও যখন অন্ধকারে ও সংশয়ে অবলুপ্ত, তখন মৃত্যুই একমাত্রশ্রেয়। কিন্তু 'আত্মহত্যা'ব্যতিরেকে যেহেতু মৃত্যুও অসম্ভব, সেজন্য দৈহিক পরাভব ভুলে, প্রতি মূহুর্তেই সে পরিবেশের প্রতিদ্বন্দ্বী, বিদ্রোহী ও আগন্তুক, নিজের বাইরে বিশ্ব তার কাছে অবান্ধবপুরী, যেখানে সে নির্বাসিত।"[৮]

বিমল কর আবার জানান,

"বর্তমান দশকের প্রান্তে এসে দেখাগেল বাংলা ছোটগল্পনতুন করে আবার সজ্জা রচনা করছে। ৩৯এর যুদ্ধ পেশাদারীভাবেথেমেছে, দাঙ্গা দেশভাগের পর শাসনতন্ত্র নিজেদের হাতেএসেছে আর তার পরও হাওড়া পুলের গা দিয়ে এক যুগ কতনাজাহ্নবী জল বয়ে গেল, এখন সে যুগের উত্তেজনা শান্ত ক্লেশবিস্মৃত, বেদনা অপসৃত। একদা আগুন লাগার কালে আমরাহত চেতন হয়ে ছিলাম এখন সে প্রলয় সময় কেটে গেলে অনেকটা সুস্থির হয়েছি, সেই ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অত:পর আশ্রয় কোথায়, এই ধ্বংসস্তুপের জঞ্জাল সরিয়ে কাজে লাগানোর মতন কি'বা নেওয়া যায়। এই দশকের লেখকেরা সম্ভবত এই কথাটি ভাবছেন। .....যে জ্বালায় আমরা পুড়েছিলুম এঁরা সেই জ্বালার তাৎক্ষনিকক্লেশ থেকে মুক্ত, সুতরাং পোড়া

> চেহাড়ার রূপটি অনেক খানি নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের প্রাথমিক আপত থেকে মুক্ত বলে এঁরা আরও ব্যাপক জগৎকে দেখায় ব্রতী।”[৯]

বস্তুত পক্ষে এই সময়ের ‘ছোটগল্পে : নতুন রীতি’নামক পত্রিকার মধ্যদিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ছোটগল্পের ধারা পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছে সে যাত্রা আজও অব্যাহত। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় গল্পের মূল বিষয় হিসেবে উঠে আসে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ক্লান্তি বোধ, ব্যক্তির নৈরাশ্যতা, অস্তিত্ব, অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, শত্রুতা, বাস্তবতা, পরিবেশ, স্বপ্ন ভঙ্গের কান্না, দ্বন্দ্ব, সংশয়, রাজনীতি অর্থনীতি, বেকারত্ব, মাতা-পিতা সম্পর্ক, সন্তানের দংশন, প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে মানুষই হয়ে ওঠে ছোটগল্পের মূল বিষয়, কাহিনির মূল্য যেন ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সুমিতা চক্রবর্তীর করা হয়েছে,

> “ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ও সার্বিক আবহের সংঘাতের ফলেই ছোটগল্পের উদ্ভব হয়। সেই আঘাতেই যুগে যুগে ঘুরে যায় তারগতিপথ। চল্লিশের দশকের ছোটগল্পকে যদিবলি সমাজ সংঘর্ষেরযন্ত্রণার আর প্রতিবাদের গল্প তাহলে পঞ্চাশের এই নব্য ধারারগল্পকেও বলব সামাজিক সংঘাতেরই পরিনাম, তবে এখানে গনউদ্দীপনায় প্রতিবাদী অভিব্যক্তির পরিবর্তে অন্তর্মুখী ও আত্মদহনক্লিষ্ট রক্ত রেখাঙ্কিত মনোচিত্রন ফুঁটে ওঠে। এখানেও মানবচিত্তে বিপুল ব্যথার সমাহারী নি:শব্দ বিস্ফোরণ থেকেই গল্পের ধারাপথ বদলায়।”[১০]

সত্য কথাই বলেছেন সুমিতা চক্রবর্তী। কেননা ব্যক্তি এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের এক আত্মিক যোগ থাকার ফলেই সাহিত্য হয়ে ওঠে সমাজের দর্পন আর সে

কারণেই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যও পরিবর্তিত হতে থাকে, তবে এই বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তাই সংক্ষিপ্ত আকারে এই সময়ের কয়েকজন গল্পকারের ছোটগল্পের আলোচনার মাধ্যদিয়ে এই নতুন রীতির প্রয়োগ দেখানোর প্রয়াস করছি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিমল কর হলেন এই নতুন রীতির গল্পকারদের মধ্যে একজন অন্যতম নেতৃত্ব প্রদানকারী পুরোধা। ঐ সময়ের একজন বিখ্যাত গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসেবেই বিমল কর পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অম্বিকা নাথের মুক্তি'এবং অন্যান্য গল্প গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল,'বরফসাহেবেরমেয়ে'(১৯৫২), 'পিঙ্গলারপ্রেম'(১৯৫৭), 'আঙুরলতা'(১৯৫৮), 'সুধাময়'(১৯৫৯), 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন'(১৯৬৮), 'মোহনা'(১৯৭৩), 'প্রেমশশী'(১৯৭৬), 'গুনেন এক'(১৯৮৪), 'উপাখ্যান মালা'(১৯৯২), 'ইঁদুর'(১৯৫৮), 'নিষাদ'(১৯৫৮), প্রভৃতি গল্প গুলি ছাড়াও আরও বহু গল্প রয়েছে, যেমন 'আত্মজা', 'মানব পুত্র', 'পার্করোডের সেই বাড়ি', 'উদ্ভিদ', 'পলাশ', 'যযাতি', প্রভৃতি গল্প গুলিতে ফুটে ওঠে বিষন্নতা, অবিশ্বাস, প্রেম, শ্রেণিবৈষম্য, সামাজিক সংকট, সভ্যতার হতাশা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ঈশ্বর চিন্তা, ধর্মবোধ, ঈশ্বর প্রসঙ্গে অবিশ্বাস, নিয়তির অন্তিম রহস্য সন্ধানের আপ্রাণ চেষ্টা, তাঁর গল্পে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে।এই সব ঈঙ্গিত গুলির মধ্যদিয়ে এটাই প্রমানিত হয় যে বিমল করের গল্প তাঁর পূর্বসূরীদের ছোটগল্পের মূল ধারাপথ থেকে যেমন হয় অনেকটা সরে এসেছে তেমনি আবার স্বতন্ত্রতারও দাবিদার হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় শীর্ষেন্দু মুখ্যোপাধ্যায়ের কথা,

> "ঈশ্বর কিংবা প্রেম কোনটিকেই তিনি এই যন্ত্রনার প্রলেপ হিসেবে ব্যাবহার করেন নি। তাঁর প্রেমের গল্পেও বিষন্নতা, তাঁর ঈশ্বর প্রসঙ্গেও অবিশ্বাস।"[১১]

তিনি আরও বলেন,

> "শান্ত কাব্যময়তায় স্নিগ্ধ, পদ বিন্যাসে পবিত্রতার আভাসমন্ডিত ভাষায় লেখা এই সব গল্প, কিন্তু অন্তর্নিহিত তীব্র, চঞ্চল আশ্রয় ভিখারী এক অসহায় যন্ত্রনা, অমোঘ মৃত্যুচেতনার দাহ, নবীনতর বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিকল্প সন্ধান গল্প গুলিকে এক ধরনের আশ্চর্য গতিবেগ দিয়েছিল।"[১২]

প্রাবন্ধিক অরুন কুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় বিমল করের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> 'গল্পের টান, গল্পের যাদু, কখনই তাঁরকাছে শেষ কথা নয়। গল্পের মধ্যে মননকে, তীব্র তীক্ষ্ণনির্মোহ জীবন জিজ্ঞাসাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের অন্তরে যে জটিলতা, অন্তরে ও বাহিরে যে সূত্র সম্বন্ধ, স্বপ্ন ও চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ, নি:সঙ্গ অন্তর্জীবনের যে বেদনা ও অসহায়তা বোধ এই বক্তব্য বিমল করের গল্পকে এমন এক স্বাতন্ত্র দিয়েছে যাকে কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুস্মৃতি বলে মনে হয় না।'[১৩]

বিমল করের বিখ্যাত গল্প 'নিষাদ'এ লক্ষ করা যায় মৃত্যু চেতনা, নি:সঙ্গতা, বিষন্নতা, শূন্যতা এবং নিয়তি বা ঈশ্বরের কাছে পরাজয় স্বীকার। 'সুধাময়'গল্পে জীবন অন্বেষণের সমাপ্তি পরলক্ষিত হয়। 'ইঁদুর'গল্পে মানুষের জীবনের মূল রূপকে বর্ণনা করেছেন। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভূবন'গল্পে মৃত্যু চিন্তা, আত্মগ্লানি বোধ, নি:সঙ্গতা বিষণ্নতা প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। 'সম্পর্ক' গল্পে প্রেম ও রোমান্টিকতার স্বাতন্ত্র্য রূপ, 'আত্মজা' তে পরিলক্ষিত হয় আত্ম সত্তার স্বরূপ। এভাবে গল্প গুলির মধ্যদিয়ে তিনি স্বাতন্ত্রকে চিহ্নিত করেন ভিন্ন মাত্রায়।

ছোটগল্পে নতুন রীতির আন্দোলনে শুধুমাত্র বিমল করই নন, তার পরবর্তী গল্পকারেরাও গল্প রচনার অনন্যতায় এক একজন এক একটি মাইলস্টোনহিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই গল্পকারদের বিখ্যাত গল্পগুলির উল্লেখ করা হল,সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম', দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'দশ বছর পরে এক দিন', স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলপোকা', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তোপ', দেবেশ রায়ের 'দুপুর'রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর', মতি নন্দীর 'ছাঁদ', 'বেহুলার ভেলা', 'চোরাঢেউ'প্রভৃতি গল্পের নাম। এই গল্পকারেরা ছোটগল্প রচনার মধ্যদিয়ে ছোটগল্পের মূল বিষয়ের মধ্যেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন। ছোটগল্প যেন লেখকদের কাছে আত্ম প্রকাশের তীব্র বাহন রূপে দেখা দিয়েছে। সংশয় এবং বিদ্রোহ থেকেও যে গল্প রচনা হতেপারে তা এই সময়ের গল্পকারেরা জানিয়ে দিয়েছেন পাঠক মহলকে। রোমান্টিক প্রেম ভালোবাসার অবসান ঘটিয়ে সে জায়গায় কঠিন রূঢ় বাস্তব চেতনাকে বারংবার ফুটিয়ে তুলেছেন। এদের গল্পে বিষন্নতা, হতাশা, বেকারত্ব, জীবন জিজ্ঞাসা, অভাব-অনটন, বিদ্রোহ, সংশয়, কৌতূহল, এবং সর্বোপরি জীবন সম্পর্কিত প্রশ্ন ও তার সঠিক উত্তর, অনুসন্ধানের তীব্রতম বাহন হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের মূল স্বরূপের পরিবর্তিত প্রকাশ ঘটল। ষাটের দশকের গল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "ছোটগল্পের ভাষায় আমূল পরিবর্তন আনছেন ষাটের দশকের ছোটগল্প লেখকরা। এই লেখকগন পৃথক পৃথক ভাবে এবং যুক্তভাবে ছোটগল্প সম্পর্কে নতুন চিন্তার অবতারনার দ্বারা নতুন নতুন ভাষার উদ্ভাবন ঘটাচ্ছেন বা ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। গল্পের কাঠামো ভেঙে দিচ্ছেন ব্যাক্ত করনের ক্ষমতা দ্বারা। ব্যাক্ত করনের ভাষাও আসছে অনুরূপভাবে। ছোটগল্পথেকে কাহিনি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তার কাহিনিরনিজস্ব ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে পুরনো ছোটগল্পযেখানে কাহিনির ভাষায়, গল্পের ভাষায় অন্তরিন ছিল, কাহিনি বিলুপ্ত হওয়ার জন্য ছোটগল্পে গল্পের ভাষামুক্তি পাচ্ছে। অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তিকে যেভাবেই প্রকাশ করা হচ্ছে সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্পের ভাষা।"[১৪]

'হিতবাদী', 'সাধনা', 'সবুজ পত্র', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী'প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা গুলি বাংলা ছোটগল্পের বিস্তরভাবে প্রকাশ, রচনা ও প্রচার করার দায়িত্ব তুলে নেয়। সেই যে সংবাদপত্রের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্প বাইরেরজগতে বেড়িয়ে পড়েছে সে যাত্রা আজও অব্যাহত, এ যাত্রার শেষ নেই, রয়েছে শুধু পালা বদলের পালা। সাহিত্য জগতে একের পর এক বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হয়েছে, সাহিত্যের ভাবধারাকে পরিবর্তনের লক্ষে। 'কল্লোল','কালিকলম' গোষ্ঠির বিদ্রোহ, 'ছোটগল্পে নতুন রীতি', নকশালবাড়ি আন্দোলন, সাহিত্য জগতে শুধুমাত্র ঝড় তুলেই থেমে থাকেনিপরিবর্তন করেছে সাহিত্যের ভাবধারা, বিনির্মাণ করেছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে। তৎসঙ্গে বিস্তার ঘটিয়েছে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার ঘরকে। এই পরিবর্তন চির নবীন, সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং মানব সভ্যতা যত পরিবর্তিত হবে ঠিক ততই পরিবর্তিত হবে বাংলা ছোটগল্পের সাহিত্যের ইতিহাসের।

ইতিহাসের দাস প্রথা সৃষ্টির আরও অনেক আগেই সংস্কৃতি নিয়ে রাজনীতির সৃষ্টি হয়েছে। আধিপত্যবাদীরা ক্ষমতা বা প্রতাপকে হাতিয়ার বানিয়ে শোষণের জন্য।এই রাজনীতিতে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ ও শাশন। সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরা শাষন ও শোষণ করত নিম্নশ্রেণির মানুষদের, মালিক দ্বারা শাসিত হত কর্মচারি, কৃষক শোষিত হত জমির মালিকের কাছে। আবার নারী শোষিত হত পুরুষের কাছে। এভাবেই প্রথাগত নিয়মে পর্যায়ক্রমিকভাবে বংশানুক্রমে শাসন পদ্ধতি চালিয়ে যেত শাসন ও শোষণের কাজ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় মহাশ্বেতা দেবীর সেই দ্যুতিময় উক্তি,

> "....স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যাবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার

> প্রেরণা, ...শোষণ নির্যাতন, প্রশাসনের মানুষমারা খেলা, অরণ্য–অরণ্যপ্রাণি-অরণ্য সন্তানদের মুছেফেলা, সংস্কারের দাসত্ব, নারীর অবস্থান, অতীতে যা ছিল, আজও তাই আছে। প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা, এ কাহিনিও নতুন কিছু নয়। .....আমি মনে করি মেয়েদের বিপন্নতা, নারী মাংসের ব্যবসা, এ সবই সত্য, কিন্তু দারিদ্র সীমারেখার নিচে যে জগৎটা বড় হচ্ছে ধাধা করে সেখানে সকলেই শোষিত ...”[১৫]

বাস্তব সত্য কথাই উল্লেখ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই উচ্চ শ্রেণির দ্বারা শোষিত ও নির্যাতীত কোথাও। তবে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এই তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সবার আগে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করেছে নারী।নারী কিভাবে সমাজ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির দ্বারা শোষিত ও শাসিত হয় তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

পৃথিবী সৃষ্টির পর আদিযুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। নারীর গর্ভবতী হওয়া, সন্তান প্রসব করা এবং শিশুকে স্তন্যপান ও লালন পালন করার সময়েই নারীকে সম্পূর্ণ ভাবে অন্দর মহলের বাসিন্দা হতে হয় উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, তাই তাদের ভরণপোষনের ক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিতা এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই সময় থেকেই নারীর জীবন দাসত্বে পরিনত হয়। এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।অথচ যুগ যুগ ধরে চলে এই দাসত্বের পালা বদলের পালা। নারীর প্রাপ্য মূল্য পৃথিবীর কোন দেশই দেয়নি। নারী কন্যা থাকাকালীন পিতার নিকটভাগিনী থাকাকালীন ভ্রাতার নিকট, স্ত্রী থাকাকালীন স্বামীর নিকট এবং জননী থাকাকালীন সন্তানের অধিনস্ত থাকে। জাতি–ধর্ম–বর্ণ–বৈষম্য-নির্বিশেষে সকল দেশের সকল স্তরের মানুষই নারীর জীবন কে পণ্যে পরিনত করেছে। নারী ব্যক্তি বিশেষের নিকট সমন্ধ বিশেষেই দামি, অন্য কোন ভাবেই নয়। পৃথিবীর কোন ধর্মেই নারীর জীবনের মূল্যায়ন হয় নি। নারী সর্বদাই ছিল নৈরাশ্য পীড়িত, হতাশাদীর্ণ প্রান্তিকায়িত ও অবহেলিত, কী প্রাচ্যে কী প্রাশ্চাত্যে। কেননা

অ্যারিষ্টটলের মতো মনীষীও ভেবে ছিলেন, 'কিছু কিছু আবশ্যিক গুনাবলী নেই বলেই নারীকে নারী হয়ে থাকতে হয়, পুরুষের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না।'[১৬] সন্ত টমাসের মতে, 'নারী হল অসম্পূর্ণ পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ, অন্য দিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরিক্ত এবং নিষ্ক্রিয়।'[১৭] কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, 'স্ত্রী লোকের বুদ্ধি কখনও আধখানা বই পুরা দেখিতে পারিলাম না।'[১৮] তার তুলিয়ানের মতে, 'নারী, তুমি শয়তানের দ্বার। তুমি তাঁকে বিপথগামী করেছ যাঁকে শয়তানও সরাসরি আক্রমনের সাহস করেনি। তোমার কারনেই ঈশ্বরের পুত্রকে মরতে হয়েছে; তুমি সব সময় শোকাকুল ছিন্নবস্ত্রে থাকবে।'[১৯] সন্তজন ক্রাইসোসটমের মতে, 'সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যেও নারীর মতো ক্ষতিকর আর কিছু নেই।'[২০] হাদিসে উল্লিখিত, 'নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোন দূর্যোগ আমি রেখে যাচ্ছি না। বা পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমি আমার পরে আর কিছু রাখিয়া যাইতেছি না।'[২১] কোঁৎ বলেছেন, 'নারীত্ব হচ্ছে প্রলম্বিত শৈশব, যা নারীর মনকে দুর্বল করে রেখেছে।'[২২] বালজাক লিখেছেন, 'নারীর নিয়তি ও পরম গৌরব হচ্ছে পুরুষের হৃদয়ে স্পন্দন জাগানো .... নারী অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঠিক মতো বলতে গেলে নারী হচ্ছে পুরুষের সহায়ক।'[২৩] ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'Observation on the feeling of the beautiful and sublime' গ্রন্থে নারী সম্পর্কে জানিয়েছেন,

> "A women is embarrassed little that she doesnot possess certain high insight thatshe is limid, and not fit for sereous employments and so forth, she is beautiful and captivates, and that is enough"[২৪]

বস্তুত নারী সর্বদাই সম্পত্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে পর্যায়ক্রমিক ভাবে। সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং বিধান সৃষ্টিকারি মহান পুরুষ ঋষি মহাঋষিরা, নিজের স্বার্থসিদ্ধির মূল বিষয়কে, সুখ স্বাচ্ছন্দকে সঠিক রেখে শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে করেছেন বিধি নিষেধের কঠোর ও বাস্তব রূপায়ন। নারীর জন্য নির্মিত হয়েছে নিত্য নতুন শব্দ ভান্ডার, যথা–অবলা,

অশুচি, বিশ্বাসের অযোগ্য, নরকের দ্বার প্রভৃতি। এই নারীর জন্যই– 'আমেরিকার অসভ্য চিপিওয়ানরা আকর্ষণ কারা নারীর জন্যে লড়াই করে। এরা নিজের জননীকেও সুন্দরী বিবেচনা করলে পিতার নিকট থেকে বল পূর্বক কেড়ে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম আদিবাসীরা নারী লাভের জন্যে বর্শাহাতে যুদ্ধকরে। আমেরিকার ডগরিব জাতির লোকেরা একই উদ্দেশ্যে পুরুষ হরিণের মতো লড়ে। আমেরিকার মন্ত্রজাতিরা প্রাকৃতিক শত্রুর মতো যুদ্ধ করে। এক জন মন্ত্র জীবনে চল্লিশ/পঞ্চাশ বার বিয়েও করে। ..... পলিনেশিয়া, নিউ কালিডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপের অসভ্য জাতিরা নিজের প্রান দিয়েও স্ত্রী লাভের জন্য লড়াই করে।"[২৫] এদের কাছে নারী সঙ্গমই বড় বিষয় হয়ে দেখা দেয়, নারীর জীবন নয়। এক বারের জন্যেও ভেবে দেখা হয় না নারীর ইচ্ছা- অনিচ্ছাকে। নারীর ব্যক্তিগত জীবন কে নিয়ে ভাবার অবকাশ থাকে না। কেননা নারীর উপর শুধু লিঙ্গ বৈষম্যের চাপই নয় রয়েছে ঔপনিবেশিকতার চাপও। এই প্রসঙ্গে মনে পরে যায় ফুকোর 'প্রতাপ' তত্ত্বের কথা,

> "We must cease once and for all to describe the;'sedulex' it: effects of power in negetive terms ; it 'marks'; it 'obstracts'; it 'censors'; it 'represses' it produces, infact power produces; it 'conceals' domains ofjects and rituals. it produces. reality of truth."[২৬]

ঔপনিবেশিক অবস্থার শিকার নারীকে অদৃশ্যভাবেই বহন করতে হয় লিঙ্গ বৈষম্যের চাপ। কেননা অত্যন্ত সুকৌশলে বল প্রয়োগ না করেও শুধুমাত্র বুদ্ধির দ্বারা নারীর মগজ ধলাই করে আধিপত্তকামী পুরুষ সমাজ। আর নারীরা সবাই সেই প্রতাপের বেড়াজালে আটকে থেকে শৃঙ্খলাকেই মূল আদর্শবাদী নীতি বলে মেনে নেয়। এই প্রসঙ্গে সঠিক কথাই বলেছেন হুমায়ুন আজাদ,

> "নারীকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বলা যায় না নারী অশিক্ষিত ; তাকে বিজ্ঞান থেকে বহিস্কার করে বলা যায় না

> নারী বিজ্ঞানের অনুপযুক্ত। তাকে শাসন কার্য থেকে নির্বাসিত করে বলা যায় না নারী শাসনের যোগ্যতা হীন। নারীর কোন সহজাত যোগ্যতা নেই, তার সমস্ত যোগ্যতাই পরিস্থিতিগত, যা পুরুষের সৃষ্টি বা সুপরিকল্পিত এক রাজনীতিক ষড়যন্ত্র।"[২৭]

এই ষড়যন্ত্র নারী কখনই বুঝতে পারেনি। আর এই বুঝতে নাপারার দরুন নারীর স্থান গৃহ পালিত পশুর থেকেও নিচে Captain Speke তাঁর 'Discovery of the source of the Nile' গ্রন্থে বলেছেন, "ওখানকার ওয়াহুমা বড়লোকেরা কথায় কথায় স্ত্রী হত্যা করে বিনা অপরাধে। আসলে পৃথিবীর সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসার সম্পর্ক অনুপস্থিত থাকে। নিগ্রোরা ভালোবাসা বা স্নেহ কাকে বলে জানে না। কাফ্রিদের অভিধানে বিয়েতে ভালোবাসা বলে কোন শব্দ নেই। জারিবদের মধ্যে স্বামী- স্ত্রীর স্নেহ বাস্তবাতীত। অথচ এদের মধ্যে দেখা যায় পতিপ্রেম ও স্বামী সেবার আদর্শ। ডাহোমান, মালগাছি, ফিজিয়ান, ছিপা ও বেচয়ানা এদের সকলের ঘরেই রয়েছে পতিব্রতা স্ত্রী। অথচ পুরুষরা জীবিতবস্থায় কী কুকর্মই না করেছেন।"[২৮]

এখানে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে, নারী আর পশু একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের বিষয় হিসেবে ব্যাবহৃত। পশু যেমন প্রয়োজনের তাগিদে পালন করা হয় এবং প্রয়োজনে সেই পশুকে হত্যা করতে, ভক্ষণ করতে পশুর মালিকের কোন দ্বিধা হয় না। নারীর ক্ষেত্রেও যেন ঠিক তাই। প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখে পুরুষ, আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নারীকে হত্যা করা বা ত্যাগ করা স্বাভাবিক ব্যপার হয়ে দাঁড়ায় । অথচ নারীরা স্বামীর পদ পল্লবে আত্ম নিবেদন করে, 'স্বর্গের দেবতা তুমি ভালোবাস মোরে।' চেতনার এই দাসত্বও দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদেরই ধরন, যা বহুদিন ধরে নারীর অস্তি–মজ্জার উপর চেপে রয়েছে।

ঔপনিবেশিকতার চাপ, পারিবারিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা বা প্রতাপের চাপ, লিঙ্গ বৈষম্যের চাপ এবং সর্বোপরি নারীর শরীর নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নারী অদৃশ্যভাবেই বহন করে চলেছে। আর সে কারনেই নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত যত সব সাংস্কৃতিক নিয়ম কানুন। বাল্য বিবাহ, অশিক্ষা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি রাজনৈতিক কৌশল গুলিকে নারী অবলীলাক্রমেই পালন করেছে। আর লিঙ্গ বৈষম্যকেই জীবনের নিয়তির পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে ভেবে নিয়েছে নারী। তবে একটু সূক্ষ্মভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে এই লিঙ্গবৈষম্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতা নামক পিতৃতন্ত্রের নানা দিকগুলো। পরিবারের ক্ষেত্রে শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, ভাষা প্রকৃতির বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই যেভাবে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে, লিঙ্গবৈষম্যের ব্যপারটিও ঠিক তেমন করেই পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা রাজনীতিরই নির্মান। আদিম কাল থেকেই নারীর সীমাবদ্ধতাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নারীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সে নারী, তার একটি গন্ডি আছে এবং সেই গন্ডির বাইরে বেরিয়ে আসাটা এক ধরনের পাপ বাঅন্যায়। যা নিয়ন্ত্রণ করে সেই ক্ষমতাবান প্রভাব প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠানিক সমাজে। প্রভাব একনিষ্ঠভাবে পরে পরিবারের উপর এবং পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেই ধীরে ধীরে শিশু কন্যাটির শৈশব থেকে বার্ধক্য এক একটি পর্যায় চিহ্নিত করে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় তার কাঙ্খিত আচরণ এবং অনাকাঙ্খিত আচরণের সীমাবদ্ধতাকে যা মানতে বাধ্য হয় নারী। এই প্রসঙ্গে মনে পরে যায় মহাশ্বেতা দেবীর সেই দ্যুতিময় উক্তি। নারীর জীবন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন,

> "সেই শিক্ষা সমাজ দিতে পারছে না যাতে ছোটবেলা থেকেইমেয়েরা ভাবতে শিখে নিজেকে এমন ভাবে গড়ব যাতে মানুষআমায় শ্রদ্ধাকরে এবং আমার সন্মান আমি আদায় করে নিতে পারব। দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম-দক্ষিণ রাজনীতিতে সবাই দেউলেহয়ে পড়ছেন। আদর্শ বিহীন এই লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতি সব রকম সুস্থ গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে গলাটিপে মেরেছে এবংমারছে।দেশের পরিপূর্ণ অবস্থার চিত্র দেশের যুবক যুবতীদের কাছে নেই, দুই

> জেনারেশনের যুব সম্প্রদায় তা থেকে বিচ্ছিন্ন। .....অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই দুই জেনারেশনের যুবশক্তিকে দুর্নীতি গ্রস্থ করে ভোগমুখি অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস এটা পার্ট অফ এ মাস্টার প্ল্যান।”[২৯]

এই গ্যাঁড়াকল যুক্ত প্ল্যানেই নারী স্বাধীন ভাবে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। পরাধীনতাই তাদের নিদান। এই পরাধীনতার বাঁধন মনে প্রানে বরণ করতে পারে যে নারী তারই প্রাপ্য পারিবারিক স্বীকৃতি। মেয়েদের জীবন পরিস্থিতিও নির্মিত হবে পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা না থাকা নিয়ে। নারী এবং পুরুষ হয়ে ওঠে আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মানুষ। শৈশব থেকেই বাবা-মা, সমাজ–সভ্যতা–সংস্কৃতি তাদের শেখায়, মেজাজ কেমন হবে, দাঁড়াবে, হাসবে, চলবে কেমন করে, তারা কী কী ভূমিকা পালন করবে এবং জানাবে কোথায় কার স্থান। এই প্রসঙ্গেই ফরাসি চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক সিমোন দ্য বোভোয়ার বলেছিলেন,

> “কেউ নারী হয়ে জন্মায় না। সমাজই তাকে নারী করে তোলে।”[৩০]

অথচ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রক্ষমতায়, দক্ষতায়, প্রশাসনিক কর্মে, শিক্ষায়, পরিবারের দায় দায়িত্ব পালনে, সংগঠনে, আন্দোলনে অবদান রাখলেও নারী ইতিহাসে সাহিত্যের স্বীকৃতিতে অদৃশ্য রয়ে গেছে। সমাজে ‘বিষয়’ হিসেবেই রয়ে গেছে নারী ‘বিষয়ী’ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু যেখানে অন্যায় অত্যাচার পীড়ন থাকে, কালের প্রবাহে প্রতিবাদ সেখানে অতি আবশ্যিক কোন না কোন ভাবে ঘটবেই। এজন্যই সমাজের গভীরে নারীর ক্ষোভ,জ্বালা, যন্ত্রনা, প্রতিরোধ গুলি ভাষাহীন অন্ধকার ভেদ করে উচ্চারণের আলোয় জেগে উঠেছে। যার ফল স্বরুপ দেখা গেছে, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিদ্রোহ, পীড়ন, নিপীড়নের বহু স্বরিক বিন্যাস। পুরুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে খুঁজে পেতে চেয়েছে তার অবস্থান এবং আয়ত্ত করে নিয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত কলাকৌশল ধীরে ধীরে নারী সমস্যা কেন্দ্রিক

সংস্কার আন্দোলন গুলোর মাধ্যমে সমাজে তাদের অবস্থানের পরিবর্তনের দাবি উঠে এসেছে এবং তা সরকারী সহায়তায় কার্যকরীও হয়েছে।

তবে এই আন্দোলন গুলি থেকে সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি পরিস্কারভাবে ফুঁটে উঠেছে। কিন্তু নারী সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেছে। সহমরণ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ সমস্যা, নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় গুলি প্রত্যক্ষ ভাবে না থাকলেও পরক্ষোভাবে তা সমাজে রয়ে গেছে। বিশেষত নারী পাচার, কন্যাসন্তান হত্যা, পণ প্রথা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে। সেলিনা হোসেন ঠিকই বলেছেন,

> "আমরা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় থেকে খুব একটা এগোইনি। এখনও বাল্য বিয়ে আছে কিশোরী পতিতার সংখ্যা প্রতি নিয়ত বাড়ছে এখন সতী দাহ প্রথা নেই ঠিকই কিন্তু ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা, খুন ইত্যাদির মধ্যে তার রূপান্তর হয়েছে। ধরণটা পাল্টেছে শুধু।"[৩২]

তথাপি বলা যায় সমাজ সংস্কৃতিতে নারী ধীরে ধীরে ক্রমশ ও ক্ষীন গতিতে শোষণহীণ সমাজ নির্মানের প্রয়াসকে অব্যাহত রেখেছে। উনিশ শতককে এই সংস্কার আন্দোলনের আঁতুড়ঘর বলতে পারি। তাই এ সময়েই সমাজের নানা স্তরে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর উন্নতির কথা ভাবা হয়েছিল। রাজারামমোহন রায় (১৭৭২), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০), মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭), প্রভৃতি ব্যক্তিরা শুরু করেছিলেন নারী সমাজের দূর্গতি দূর করার সংগ্রাম, সে সংগ্রাম আজও অব্যাহত। সেহেতু সমাজে এই জাগরণের বানী আন্দোলিত হয়।তবে প্রতিবাদকে প্রতিষ্ঠার বিকাশ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নারীর প্রতিবেদনে আরো অনেক পরে দেখা গেছে। ধর্মীয় বেড়াজালকে ছিন্ন করে গৃহকর্মেনিপুনা নারী বাহিরেও অন্য এক কাজের জগৎ তৈরি করে এবং পাল্লা দিচ্ছে পুরুষের সঙ্গে। দক্ষতা দেখিয়েছে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম নীতি এবং সামাজিক রাজনীতিতে। সাহিত্যেও ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নারীরা নিজেই

নিজের হাতে, এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় কয়েকজন ইতিহাস সৃষ্টিকারী নারীর নাম, যথা- গিরিবালা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল, মল্লিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতো লেখিকা যারা নারীর জীবন।

মহাশ্বেতা দেবীও পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পন করেন। তবে ধীরে ধীরে তিনি গল্পকারদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা রীতিকে বর্জন করে স্বতন্ত্র ধারায় গল্প রচনা করা শুরু করেন। পাঠক বর্গের কাছে তুলে দেন ছোটগল্পের আর এক নতুন স্বর। মহাশ্বেতা দেবীর আগে পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সমাজের শোষণ, দাঙ্গা, বিদ্রোহ, সংঘাত, সংশয়, কৌতুহল, রোমান্টিক প্রেম, দাম্পত্য জীবনের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, নারী–পুরুষ সম্পর্ক, পিতা–মাতা–পুত্রের সম্পর্ক, সামাজিক দাঙ্গা, ধর্মীয় সমস্যা, বেকার সমস্যা, কৃষক সমস্যা, জমিদারি শোষণ, অভাব–অনটন, নিম্নশ্রেণির মানুষ, গ্রামের মানুষ, দারিদ্রতা, ক্ষুধা প্রভৃতি বিষয় গুলি ছোটগল্পের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর চির পরিচিত ও প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে আর এক নতুন কাহিনি ও নতুন বিষয়কে তুলে ধরেন তার বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। আর এই নতুন বিষয় হল চিরশোষিত, অবহেলিত, নিরন্ন নির্বস্ত্র আদিবাসী সমাজ। যার অন্তর্গত রয়েছে কোল–ভিল, মুন্ডা, ডোম ও চির যাযাবর শ্রেণির মানুষ। মহাশ্বেতা দেবীর আগে কেউ আদিবাসী সমাজকে নিয়ে গল্প বা উপন্যাস রচনা করেনি এমন নয়। তবে এটুকু অনায়াসে বলা যায় যে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে আদিবাসী সমাজকে যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন আর একজনকেও খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র সি. সি. কেমেরা দিয়ে আদিবাসী সমাজের গোটা ছবিটাকে সাধারণ পাঠক বর্গের কাছে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেননি তাদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের অস্তিত্বহীনতার শেকড়ের মূলকে

অনুসন্ধান করেছেন। শুধুমাত্র গল্পের বিষয় অনুসন্ধানই তাদের কাছে যাননি। নিজেকেও করে তুলেছেন তাদের আরো একজন। মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যে পদার্পন করেই যে আদিবাসী জন-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পরেন এমনটি নয়। পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করলেও পুরোপুরিভাবে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় স্থান পায় সাধারণ গৃহহীন, ভূমিহীন নি:স্ব জনেরা যারা প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা এবং এ পর্বে ইতিহাসের পদচারনা তাঁর লেখায় স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলি হল, 'প্রেমতারা', 'তিমির লগন', 'পরম পিপাসা', 'আধার মানিক', 'দুস্তর', প্রভৃতি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা মহাশ্বেতার লেখায় খুব একটা স্থান লাভ করতে পারেনি। কিন্তু 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), রচিত হওয়ার পর থেকে আদিবাসী সমাজ জীবনের সঙ্গে মহাশ্বেতার আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং সে সম্পর্ক আজও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। কোল, ভিল, মুন্ডা, হো, লোধা, প্রভৃতি আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পরগনা গুলিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে এই অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রনা গুলিকে আত্মস্থ করেছেন এবং নিজেও হয়ে ওঠেন তাদেরই একজন সুখ-দু:খের সঙ্গী। তাদের ভাষা, আদর্শ, নীতি এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় গুলি তাঁর কলমে নতুন ভারতবর্ষের সন্ধান করে বোঝাতে চান স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এরাও প্রান বিসর্জন দিয়েছে, লড়াই করেছে, বিদ্রোহ করেছে। অথচ এরা আজও প্রান্তিকায়িত, কী অর্থনৈতিক জীবনে, কী পরিবহন ব্যবস্থায়, কী শিক্ষায় কোনোভাবেই এদের পরিবর্তন হয়নি। এরা আজও অরণ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এদের না ছিল কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার, না ছিল কোন রাজনৈতিক পরিচয়, নাছিল স্কুল–কলেজ, না ছিল পানীয় জলের ব্যাবস্থা, না ছিল কোন চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ কেন্দ্র। অথচ এদেরকে ভারতীয় রাজনীতির মাধ্যমে শোষনচক্র চক্রাকারে ঘুরতে থাকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও ওড়িশ্যার এই আদিবাসী এলাকা গুলিতে আজও কিছু কিছু জায়গায় এই সমস্যার সমাধানের নিম্নতম ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত হয়নি। এই অনগ্রসর আদিবাসী মানুষগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা থেকেই মহাশ্বেতা দেবী এই এলাকা গুলিকে স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হাতে কলম তুলে নিয়েছেন নির্মাণ করেছেন বহু জনকল্যানকর কমিটি যাতে এদের উন্নয়নে কোন বাধা বিপত্তি না আসে। প্রয়োজনে-

অপ্রয়োজনে, পথে-বিপথে থাকার জন্য দিয়েছেন পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। আজও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আসছেন। আজও তাদের সমস্যার জন্য মূল্যবান উপদেশ দিয়ে থাকেন, কখনো পত্র পত্রিকায়, কখনো চিঠিপত্রে, কখনো বা টেলিভিশনে। আর এ কারণেই মহাশ্বেতা মুন্ডাশ্রেণির মানুষের কাছে হয়ে ওঠেন মারাঙদাউ (বড় দিদি)। হো সম্প্রদায়ের কাছে আজিম (বড় দিদি) এবং কারও কারও কাছে 'মা'। দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের দু:খ, জ্বালা, যন্ত্রনাগুলিকে জানতেন বলেই আদিবাসী প্রান্তিকায়িত মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে পেরেছেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নতুন ধারার গল্প উপহার দিতে পেরেছেন। মহাশ্বেতার ভাষাকেই খানিকটা ঘুরিয়ে বলা যায় যে নিম্নশ্রেণির মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে এবং লিখতে লিখতে নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছেন ঐ সর্বহারা শ্রেণির মাঝে। একটি সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতাকে প্রশ্নকরা হয়,

"আদিবাসী উন্নয়নের কাজে এবং ভিন্নধরণের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে মহাশ্বেতা যে প্রভুত সময় ব্যয় করেন, তাতে তাঁর লেখালেখির কাজে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে। তাতে কী সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না?'

এই প্রশ্নের উত্তরে মহাশ্বেতা বলেন,

> 'বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হল কি না হল, তা আমার বয়ে গেল। তার জন্য আমি কিছু মাত্রভাবি না। আমার জীবিতকালে চেষ্টার দ্বারা যদি যাবজ্জীবন জেলে – থাকা বন্ধিদের মুক্ত করতে পারি, অঞ্জলি সরকার যে কেরালায় বন্ধি ছিল যদি তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, যদি আদিবাসী সমাজের সেবায় আমি এইভাবে জীবন কাটাতে পারি তাতে আমার সাহিত্যের ক্ষতি হলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ মানুষের জন্য কাজ না করে আমার উপায় নেই প্রত্যেক মানুষেরই উচিৎ কর্মময়তার মধ্যে.....। মানুষের

> জন্য কিছু যে না করে সে খুব ছোট হয়ে যায়।শুধু নিজের জন্য বাঁচার কোন মানে হয় না।”[৩৩]

মহাশ্বেতার কথার সঙ্গে কাজের এক অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। কেননা তাঁর মুখের কথা আর সাহিত্যের ভাষা, গল্পের বিষয়, সংগ্রাম সবই মিলিয়ে এক সংগ্রামী কথাকার। গল্পের বিষয়ের জন্য নিম্ন শ্রেণির মানুষের কাছে আসেন এবং অবশেষে নিজেই হয়ে ওঠেন সর্বহারা শ্রেণির প্রধান নেত্রি তথা গল্পের এক অন্যতম প্রতিবাদী চরিত্র। অন্য আর একটি সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়,

> ‘‘আপনার কর্মক্ষেত্রে সাহিত্য ও জীবন কীভাবে এক করে নিলেন?’ উত্তরে তিনি জানান ‘নিরন্তর কর্মের দ্বারা। সাহিত্য এক রকম হবে, আর আমি বিলাসী জীবন যাপন করব, আবার সংগ্রামী সাহিত্য লিখব তা হয় না। আসলে ভোগের প্রতি আমি আকৃষ্ট নই–সম্পূর্ণ মূল্যদিতে পারি না। যেমন, আজও ৫০০/৭০০ টাকার জিনিস কিনে ব্যবহার করতে খারাপ লাগে। যা এ প্রজন্মের লোকেরা বুজবে না। আমার বিশ্বাস–কর্মেই মুক্তি।”[৩৪]

মহাশ্বেতা দেবী ব্যক্তিগত জীবনেও অভাব–অনটনের সঙ্গে লড়াই করেছেন। তাছাড়া নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতিকেও দেখেছেন এবং ভীষণভাবে পর্যবেক্ষণও করেছেন। যার দরুন তিনি এই সর্বহারা শ্রেণির মাঝে কখন যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেনতা বোধয় তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি। কেননা মহাশ্বেতার গল্পগুলি অধ্যয়ন করলে এ বার্তাই আমাদের কাছে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়। ‘বান’, ‘বাঁয়েন’, ‘দ্রৌপদী’, ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘জগমোহনের মৃত্যু’, ‘শ্রী শ্রী গনেষ মহিমা’, ‘দৌলতি’, ‘পালমৌ’, ‘টেরোডিকটিল পুরণ সহায় ও পিরথা’, ‘এম.ডব্লু.বনাম লখিন্দ’, প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে মহাশ্বেতা যেন সমস্ত উত্তাপকে শুষে নিয়েছেন নিজের মধ্যে এবং সমস্ত উত্তাপকে শুষে

নিয়ে আচমকা ফেটে পড়েন সমাজের শোষকশ্রেণির উপরে। আদিবাসী সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন পাঠক শ্রেণির কাছে।

মহাশ্বেতার এরকমই একটি গল্প 'অপারেশন বসাই টুডু'(১৯৭৭)। এই গল্পে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সমাজের জীবন যাত্রা, বঞ্চনা এবং শোষনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। গল্পের নায়ক বসাই টুডু এক আদিবাসী সন্তান। 'চরসা' গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের চারিদিকে বন-জঙ্গল, লতা-পাতায় পরিপূর্ণ, বর্ষায় জল জমে, গ্রামে কোন গাড়ি চলেনা। স্কুল নেই, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, পেটে ভাত নেই। এরা পুষ্টিকর খাবার খাওয়া তো দূরের কথা চোখে পর্যন্ত দেখতে পায় না। ভূমিহীন, জমিজমা হীন, অন্নবস্ত্র হীন ভাবে জীবন যাপন করে। বংশ পরম্পরায় জমিদার, জোতদার, মালিক, মহাজন দের জমির কৃষি কাজের শ্রমিক। তারও আবার ন্যায্য মূল্য টুকু পর্যন্ত পায় না, অপরদিকে যদি সাধারণ মানুষের কারো কারো কিছু পরিমান জমি থাকলেও বিভিন্ন চাপে মহাজনকে জমি দিতে বাধ্য হয় এবং মজুরির জীবন-যাপনে সময় অতিবাহিত করে। সরকার এই মহাজনদের হাতের মুঠোয়। মহাজনের কথাই এখানে রাষ্ট্রীয় আইন। পুলিশ প্রশাসন এদের কথাতেই উঠেবসে, আর মহাজন শ্রেণির মানুষেরা একচেটিয়া ভাবে নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই নতুন নতুন আইন তৈরি করে এবং এই নিরন্ন নির্বস্ত্র সমাজে তা প্রয়োগ করে। সরকার, পুলিশ প্রশাসন এদের মদত দেয় বলেই এরা এতটা মাথায় ওঠে। অপরদিকে সাধারণ শোষিত আদিবাসী নিম্নশ্রেণির মানুষেরাও এদের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন ও প্রতিবাদ করার আগে কয়েক বার ভাবতে বাধ্য হয়। সরকারী আইন শুধুমাত্র আইন হিসেবেই থেকে যায় বাস্তবে তা কখনও প্রয়োগ হয় না। লেখিকার মতে,

> "গৌর যা পশ্চিমবঙ্গের সকল জোতদারই তা। .....উৎসাহী রিসার্চ স্কলাররা এদিকে এখনও নন রিসার্চ ফেলোশিপ অধ্যাবসায় নিয়োগ করেন নি বলেই জানা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের জোতদাররা যে সর্ব ক্ষমতাসীন আইন, আদালত, পুলিশ, ট্যাঁকে রাখেন"[৩৫]

আর এই কারণেই মহাজন, জোতদার, আরতদারদের ন্যায়-অন্যায় বলে কোন কাজ হয় না। যত অন্যায় হয় সব ঐ খেটে খাওয়া মেহনতি করা নিম্নশ্রেণির মানুষের। কারনে অকারণে নিজের সুযোগ সুবিধা মতো এই শ্রেণির, মানুষদের উগ্রপন্থি, জঙ্গি, নকশালবাদী আখ্যায় ভুষিত করে অ্যান্টকাউন্টার করা হয়। কেননা এদের অ্যানকাউন্টারের কৈফিয়ত দিতে হয় না। এদের মধ্যে জবাব চাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু এরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে সামনের সারিতে তীর-ধনুক, বল্লম, বর্ষা হাতে যুদ্ধ করেছে, মৃত্যু বরণ করেছে অথচ,

> "আদিবাসী হয়ে কেউ যদি জন্মায়, তবে সে বঞ্চনা বোধ নিয়ে জন্মায়, তার শরিক আপার কাস্ট কোন বর্ণ হিন্দু হতে পারে না। এই বঞ্চনা বোধ ডেটস ফারব্যাক। কৃষ্ণ ভারতের কৃষ্ণ আদিবাসী প্রথম সন্তান। তারপর আর সবাই সে আদিবাসীদের বঞ্চিত করে সকলে নিয়ে নিলো সব, ভাগ করে নিল। সেই বঞ্চনাবোধ থেকে শুরু। তারপর দিনে দিনে শক-হুন দল, পাঠান-মোঘল-সবাই ভারত দেহে লীন হয়। আদিবাসীরা সকল শাসন ব্যবস্থাতেই হতে থাকে বঞ্চিত। ভাল শাসক, মন্দ শাসক, সকল মুনিসে প্রজাসম বক্তা অশোক, সর্বস্ব দাঁতা হর্ষবর্ধণ, বঙ্গাব্দ প্রচলন কারী শশাঙ্ক থেকে শুরু করে শেরশাহ-আকবর-বনিকের মানদন্ড হাতে ইংরেজ, কেউ এই সমস্যার কথা ভাবেন না। এবং সকল রেজিমেই আদিবাসী সকল, মৌল অধিকার সারেন্ডার করতে করতে নিতান্তই কোমড় ভাঙ্গা, হীনবল, মদেচুর, মহাজনের সুদ ও বেঠবে গরীব শিকার হয়ে মিশনে ছোটে কোন আশার তারনায়। সফল হয় না। প্রাচীন প্রজ্বলন্ত বলিষ্ঠতা সারভাইব করানোর প্রাহশনিক প্রচেষ্ঠায় হোলির দিন শিকারে ছোটে এবং আদি পুরুষের বলিষ্ঠ হাতে বর্ষা বা

> তীর বিদ্ধ বাঘ ভালুক স্মরণে পিলে পোটকা হাতে শজারু বা বন বিড়াল মেরে ফিরে আসে ঘরে, আরও মদ খেয়ে স্বাস্থ্য জলাঞ্জলি দেয়। অবশেষে ভারতের স্বাধীনতা ও ট্রাইবেল কল্যানে প্রশাসনিক প্রচেষ্ঠা তাদের শেষ বাসটি দেয়'[৩৬]

সরকারের বিভিন্নসংস্থা ক্ষেত মুজুরদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প খুলেন। এদের সাহায্য উন্নয়নের প্রচেষ্টায় কিন্তু আর এক শ্রেণির মানুষেরা তা করতে বিরোধী শক্তি হয়ে দেখা দেয়। অসাধু উপায়ে সাধারণের জন্য বরাদ্দ অর্থকরি আত্মস্যাৎ করে। মহাজন জোতদারেরা ঋণদান করেন এবং সাধারণ নিম্নশ্রেণির আদিবাসীদের ধরতে থাকেন সুদের পর সুদ। যা থেকে এই শ্রেণির মানুষেরা কোনদিনই মুক্ত হতে পারেনা। কোন কৃষক মজুর যদি একবার এই ঋনের ফাঁদে পড়ে ঋণের বোঝা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে কয়েক প্রজন্ম ধরে। নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যদি কোন সৎ পুলিশ অফিসার অথবা ভালো কোন মানুষ আসে তবে তাঁরাও রাজনৈতিক চাপের ফলে, উচ্চপদস্থ অফিসারের চাপে নিরব থাকতে বাধ্য হয়। আর এর ফল স্বরূপই বসাই টুডু, দৌপদী, সুবোধ রুহিদাস, লক্ষিন্দ, সোমরা টুডু, ছিছরণদের মতো সাধারণ মানুষের আন্দোলন ও অধিকার থেকে বিচ্যুত হওয়ার এক অন্যতম কারণ।

> "প্রশাসন মা হয়ে ভোলায় ও বাপ হয়ে খ্যাঁটামারে এই দৈত ভূমিকা কাজ করে। প্রশাসন কালী সাঁতরাকে বলে যাও টুডুকে সনাক্ত কর। তারপর গোপনে ফাইলে লেখে, সন্দেহ জনক চরিত্র বসাইকে চিহ্নিত করতে গেছেন।"[৩৭]

এরা কী মধ্যবিত্ত, কী নিম্নবিত্ত, কোন শ্রেণির মানুষকেই বিশ্বাস করে না। শুধু একটা বিষয় জানে ঘৃণা করতে ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে। আর এই হাতিয়ে নেওয়ার কারণেই কালীবাবু বেতুল কাওরা ও ময়েশ তালিদের মতো বৈপ্লবিকদের জমি

চলে যায় জমিদারের বা মহাজনের জাবদা খাতায়। আর সে কারণেই কালী সাঁতরার সুখ দু:খের ভাগিনী গিনিমালা তাঁর ছেলেকে বলে,

> "আমার শ্বশুরের জমি উদ্ধার কর বাবা। মহাজনের জাবদা খাতাটি অজগর সদৃশ। গিলতে জানে, উগ্রতে জানেনা। সে খাতা থেকে সে জমি বেরোয় না আর, কেননা ভাঙা জমি – বতর জমি নকল জমি – দোফলনী জমি সকল জমি অভিমুন্য বা অজগরের খাদ্য। জাবদা খাতায় ঢোকে হুড়োহুড়ি করে, বেরোতে জানেনা। জমিও জাবদা খাতার খাদ্য–খাদক সম্পূর্ণ সমুদ্র মন্থন বা বেদের হোমা পাখির চেয়েও পুরোনো, তাই কাষ্ঠমনি সাঁতরার জমিটমি উদ্ধার হয় না।"[৩৮]

আবার এই শ্রেণির মানুষ দিয়েই চলে রাজনৈতিক ছলা-কলার কাজ। কেননা কিষাণ সভার জন্য এই শ্রেণির মানুষেরই দরকার হয়। এরাও দলে দলে ময়মনসিং পর্যন্ত যায় পয়তাল্লিশ সালে। তেতাল্লিশ সালে নালিতাবাড়ি কনফারেন্সে যায়। সেখানে গিয়ে সরকার কর্তৃপক্ষের কাছে এম. ডব্লু. দাবিকরে এবং পেয়েও যায়। কিন্তু পরক্ষণেই এদের সমস্ত জমি বেদখল করে নিম্নশ্রেণির মানুষদের কৃষক থেকে বঞ্চিত করে ক্ষেতমজুরে পরিনত করে। একই পার্টিতে অংশগ্রহন করে সমস্ত প্রভুরা যখন চায়ের পেয়ালায় চা খায় এবং সাধারণ নিম্নশ্রেণির সন্তানরা মাটির ভান্ড পান, তখনই আর বলার অপেক্ষা রাখেনা এদের বৈষম্য। অথচ সত্য নিম রসের মতো তেতো ও সত্য কথা প্রকাশ করলে এরা হয়ে যায় অপরাধী। এই অপরাধে অপরাধী বসাই টুডুর নাম ওঠে পুলিশ থানার অ্যানকাউন্টার লিস্টের প্রথম সাড়িতে লাল কালিতে। কেননা বসাই টুডু হচ্ছে একজন প্রকৃত পক্ষের সত্যের দিশারী। সে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন করেছে। আন্দোলন করছে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা, ক্ষমতায় থাকা মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে। আর এটাই হচ্ছে তার প্রথম ও চূড়ান্ত অপরাধ। তাইতো তাকে মহাজন শ্রেণি ও ঘুষকর পুলিশ প্রশাসন বানিয়েদেয় নকশালবাদী, অথচ বসাই নকশাল নয়। সে হয়েছে

শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, শ্রেণির অতি আপনজন। এদের সার্থে বসাই মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর এই অপরাধেই বসাই চার চার বার অ্যানকাউন্টার হয়। একারণেই কালী ভারতবর্ষের প্রশাসন, কৃষান সভা, কমিউনিস্ট পার্টি এসবের ধারা বাহিক নিয়ম কে মইয়ের নিয়ম বলেছেন,

> "মইয়ের নিচের সিঁড়িতে পা রেখে ওপড়ে উঠতে হয় ও নিচের ধাপ গুলো ভুলে যেতে হয়। ভারতে ধর্মে–রাজনীতিতে ব্যাবসায়–শিক্ষাক্ষেত্রে–ব্যক্তি জীবনে–উপরে ওঠার একই নিয়ম, মইয়ের নিয়ম। এই ট্রাডিশনের নামই ভারতবর্ষ। গুলিখায় সাধারণ কর্মী, নাম হয় জেলের নিরাপত্তার প্রথম শ্রেণির বন্দি লিডারের–ভারতীয় ঐতিহ্য।"[৩৯]

কালী সাঁতরার মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা সত্যিকথাই উল্লেখ করেছেন কেননা সাংস্কৃতিক রাজনীতির ঘেরাটোপে ধনী হয়েছে আরও ধনী আর গরীব আরও গরীব হয়েছে। প্রতিবাদ গড়ে উঠলে রাজনীতির অন্য আরেক মাত্রা প্রয়োগ করে দমন করার চেষ্টা করা হয়। প্রয়োজনে প্রান নিতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনই পরিস্থিতির মধ্যে পরেছে বসাই টুডু। তাকে এক এক বার করে তিনবার অ্যানকাউন্টার করেও পুলিশের, মহাজনের, জমিদারের মনের স্বাদ মিটেনা। কেননা বসাই টুডু মহাজনের স্বার্থে হাত বাড়িয়েছে। মজুর শ্রেণির মুজুরি প্রাপ্য মুল্যের জন্য লড়াই করেছে। সাধারণ মানুষের দু:খ দুর্দশার জন্য বরাদ্ধ টাকা মহাজনেরা নিজেরা ভাগ–বাটোয়ারা করে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র কাজে লাগায়নি বন্যার জন্য ঘর বাড়িহীন দুখি দরিদ্র নেংটেদের গৃহ নির্মানের টাকা প্রতাপ একাই হজম করেছে। সে ধানচাল রাখার জন্য পাকা গুদামঘর বানিয়েছে। প্রতাপের কথাতেই উথাল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাড়িয়েছে 'যেতেমুচি'। বানড়িতে গ্রাম্য হেলথ সেন্টার নির্মানের টাকায় প্রতাপ তার নিজের ধান চালের লড়ি চলাচলের জন্য পাকা সড়ক নির্মান করেছে। পার্শ্ববর্তী পঁচিশটি গ্রামের মহাজন প্রতাপ। উকিল, হাকিম, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, অফিসারদের সঙ্গে প্রতাপদের উঠাবসা যাতায়াত। আর এর ফল স্বরূপই

মহাজনেরা মজুর শ্রেণির মানুষের কর্মের ন্যায্য মুল্যের থেকে বারো আনাই পকেটে রাখেন। যা তারা বুঝতেও পারেনা। অথচ

> ‘ক্ষেতমজুরেরা জানেনা ভারত স্বাধীন। তারা ভাবে আগে যাদের ইংরেজ বলা হত এখন তাদেরই বলা হচ্ছে ভারত সরকার। দশ শতাংশ বলে, ক্ষেত মজুরের নূন্যতম মুজুরির কথা তারা কখনো শুনেনি।’[৪০]

অথচ ১৯৬৮তেই ঘষিত হয় মজুর শ্রেণির মানুষের প্রতিদিনের মজুরির তালিকা। সেখানে পুরুষরা তিন টাকা চুয়ান্ন পয়সা, মেয়েরা তিনটাকা সাতাশ পয়সা, শিশু শ্রমিক দুই টাকা দুই পয়সা। আর পাবার বেলায় মজুরেরা পায়, যারা বড় তারা সাইত্রিশ পয়সা আর জল, পানি, পেয়াজ, মুড়ি পেলে পায় পঁচিশ পয়সা। অপর দিকে ছোটরা পায় ত্রিশ পয়সা কিন্তু মুড়ি, জল, পেঁয়াস পেলে পায় পঁচিশ পয়সা। আর বাকি সব মহাজনের গুদামে জমা হতে থাকে। এই জমা টাকায় জমির পর জমি ক্রয় করতে থাকে। রামেশ্বর ভূঁইঞা একাই পনেরো হাজার বিঘা জমির বেনামি মালিক। এদের বাড়িতে বাংলো থাকে, বার, সুইমিং পুল, মাছ ধরার পুকুর থাকে। এরা ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহী প্রজাকে ধরে এনে বলি দিতে পারে। ‘স্বামীরা যেমন দ্বিতীয় পক্ষকে বোঝাতে পারেনা, ওগো! আমার এক ক্ষমাহীন কর্ম জগৎ আছে! প্রশাসনও জোতদারদের বোঝাতে পারেনা, ওগো! আমার ছল ধরতে এক ক্ষমাহীন প্রেস আছে। আমার ছল বেরহলে আনন্দ করতে এক বহির ভাতর আছে।’[৪১]

১৯৭৪ সালে আর একটি ওয়েজ রেট এগ্রিকালচারাল লেবারদের জন্য যুক্ত হয়। মহাশ্বেতা বিষয়টি বর্ণনা করেন এভাবে,

> “The minimum rate for wages as revised above are on the basis of agricultural consumer price index (60-61=100) for 1972–73 at 233

> points the minimum rates of wages will be adjusted at the rate of 62 poise per month per point of rise or fall in the consumer price index above or below 233 points for the adults and at the rate of 45 paisa par points for the children . But in any case the minimum rates of wages will not be less then the rates mentioned above”[৪২]

নোটিফিকেশনের শব্দবিন্যাসে ভুল থেকেই যায়, কেননা ২৩৩ জায়গায় হবে ২১৯। আর ১৯৭৬ এ আবার এম.ডব্লু’র রেট পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে বয়স্কদের দিন মজুরি পাঁচটাকা ষাট পয়সা + দুইটাকা পঞ্চাশ পয়সা = আটটাকা দশ পয়সা। মাসিক মুজুরি প্রাথমিক ভাবে আশি টাকা ষাট পঁয়সা ও মাগগিভাতা পয়ষট্টি টাকা দশ পঁয়সা = একশ পয়তাল্লিশ টাকা ষাট পঁয়সা। শিশু শ্রমকিকদের জন্য দিন মজুরি চাঁর টাকা, মাগগি ভাতা একটাকা বেরাশি পঁয়সা = পাঁচ টাকা বেড়াশি পঁয়সা। মাস মুজুর উনচল্লিশ টাকা মাগগি ভাতা সাতচল্লিশ টাকা পঁচিশ পঁয়সা = ছিয়াশি টাকা পঁচিশ পঁয়সা। অথচ এই মুজুরি আদিবাসী শ্রমিকেরা কখনই পেতনা। আর এই বিষয়ে আন্দোলনেই বহু আদিবাসী যুবক–যুবতি, শিশু প্রাণ হাড়িয়েছে। বসাই এই কারণেই তিন বার মৃত্যু বরণ করেও বেঁচে যায়,

> ‘যে পার্টির ব্যানারেই যাক, খেত মুজুর খেত মুজুরই থাকবে। তারাই লড়বে যারা টারবুললেন্ট, সামন্ত, সরকার কি চায়, যারা টার্বুলেন্ট, তারা মারামারি করে মরুক, দাঙ্গা–হাঙ্গামা ফৌজদারি অপরাধ হোক, পুলিশ তাদের ধরুক, জোতদার মহানন্দে বিরাজ করুক।”[৪৩]

এই রাজনৈতিক ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি পেতেই বসাইদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ চলতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। বহু কৃষক আদিবাসী মজুরের প্রান ধুলিসাৎ হয়ে গেছে পুলিশের গুলিতে, দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে জমিদারের লাঠিয়ালের লাঠিতে। তবুও তারা বিদ্রোহকে থামায়নি। এরা বুঝতে পেরেছে মহাজনের রাজনীতির চক্রান্ত। বুঝতে পেরেছে সরকারের নিয়ম নীতি মানেই এদেরই আর এক রূপ এবং বুঝতে পেরেছে ইংরেজ বা ব্রিটিশ মানেই বর্তমানের ভারত সরকার। তাই তো তাদের আন্দোলন বিদ্রোহ চলতে থাকে। বসাই গ্রামে গ্রামে আস্থানা করে গ্রামের মানুষকে সচেতন করে। জলে–জঙ্গলে, ঝোপে–ঝারে, বসবাস করে বসাই। তাকে কখনো দেখা যায় না। পুলিশ, জমিদার, মহাজনের লাঠিয়াল গরু খোঁজা খুজতে থাকে, কিন্তু বসাইয়ের দেখা কখনো পায় না। কেন না বসাইয়ের দেখা পাওয়া যায়, আন্দোলনের দিন, আদিবাসী সমাজের মানুষ ছাড়া আর কেউ তাকে চিনে না। সরকারী খাতায় তার বিবরণ রয়েছে কিন্তু কোন ছবি নেই। তাকে চেনার এক মাত্র উপায় সে রেগে গেলে হাত দিয়ে বাতাসের গোলা মোচরদেয়। বিখ্যাত ধান ক্ষেতের মঞ্চে মহাজন রামেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বসাই টুডু চুক্তি করতে থাকে ক্ষেত মজুরের মজুরির ন্যায্য মূল্য। পাশে থাকে তার শত শত সাঁওতাল তীর-ধনুক, হেঁসো, টাঙিটাটা, কোঁচবর্শা, বল্লম নিয়ে। রামেশ্বর তাদের দশ দিনের কাজের মূল্য না দেওয়ার অস্বিকারে বসাই যুদ্ধের ডাক দেয় সমস্ত আদিবাসী মজুর শ্রেণিকে।

> “বসাই ধান ক্ষেতে চেঁচিয়ে ওঠে’, ‘মা- হো। ধান ক্ষেত সাজাও আর লঢ় হে’তার যুদ্ধের শেষে মাহাতোতে ভীষণ কারেন! চমকে রামেশ্বর লাফিয়ে ওঠে ও গলনলীতে বসাইয়ের টেটাঘায়। পলায়নপর সাঁওতালদের ওপর গুলি। ধান ক্ষেত হতে তীর। ধান ক্ষেতে আগুন। আগুন, আগুন। গুলি ও তির। এস. আই চেঁচিয়ে ওঠে ও হেঁসোর আঘাতে ঢলে পড়ে। গুলি, গুলি, গুলি। বসাইয়ের কোঁচ ডি. এস. পির পেটে। বসাইয়ের পায়ে গুলি। বসাইয়ের পেটে বেয়নেট। সঙিনের ফলা মুখে। তরঙি হম লঢ়েঙ্গে। পুলিশের পায়ে তির। কুচিলা। বসাই ঢলে পড়ে। কংগ্রেসী ছেলেড়া

> ছুটে গিয়ে ভ্যানে ওঠে। কোঁচসুদ্ধ ডি. এস. পি'র ছোটা ও পড়ে গিয়ে পা ছোঁড়া, আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা একেবারে আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। ....ভ্যানে জীবন্মৃত ও খাবি খাওয়া রামেশ্বর, ডি. এস. পি., বসাই, মৃত এস. আই – দুজন সাঁওতাল ওঠে।"[৪৪]

জেলে বসাইয়ের উপর নিক্ষিপ্ত হয় অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন, মৃত্যু নেশায় বসাইয়ের চোখ ঢলে পড়ে। তথাপি হাতের আঙুল দিয়ে কী যেন লিখতে থাকে। কী যে লিখতে থাকে তা কেউ বুঝতে পারেনা। অবশেষে শক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকা নিথর দেহটা ধীরে ধীরে পাষাণে পরিণত হয়।

বসাই মৃত্যু বরণ করে। সাধারণ আদিবাসী সমাজের নিম্নশ্রেণির বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বিপ্লবের মৃত্যু ঘটেনা। আজ যে স্থানে বসাই ছিল কাল সেই স্থানে চলে আসে দ্রৌপদী। বসাই মরে যায় ঠিকই কিন্তু মহাজন ও পুলিশের কাছে এটাও বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, তারা শুধু মাত্র মজুর হয়ে থাকার জন্যেই পৃথিবীতে আসেনি। পৃথিবীতে কেউ আদিবাসী বা মজুর হয়ে জন্মায় না। এদেরকে মজুর তৈরি করা হয়, বঞ্চিত করা হয় এবং অবহেলা করা হয়। তাইতো বসাই টুডু সরকার, পুলিশ এবং মহাজন দের জানিয়ে দিয়ে যায়, আমরাও আজ নিজের দাবিগুলি আদায় করতে ও বুঝতে শিখেছি। আমরাও প্রতিবাদ করতে শিখেছি কেননা আমরাও যে ভারতমাতারই সন্তান। তাই আমাদের আর কোন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র বঞ্চিত করে রাখতে পারবে না। আমরা যত দিন এই ভাবে বঞ্চিত থাকব, ততদিনই এভাবে লড়াই করব। এই বসাই টুডুর মৃত্যু হলেও আরো হাজার হাজার বসাই টুডুর জন্ম হবে। এই বার্তাই যেন বসাই টুডু মৃত্যু সজ্জায় সজ্জিত হয়ে হাতের রক্ত মাখা আঙুল দিয়ে লিখে জানিয়ে দিয়ে গেছেন। আর তখনই গল্পের কাহিনির স্বর শুধু মাত্র পাঠকৃতির স্বরেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। বিদ্রোহের এক অন্ত:স্বর নির্মিত হয়ে যায়। যা পর্যায় ক্রমিক ভাবে পাঠকের অন্তরে স্বরান্তরের ভিন্ন মাত্রা নির্মাণ করে।।

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনের সমস্যা গুলিকে তুলে ধরেন এবং তাদের এই অনগ্রসরতার মূল কারণ গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। এবং এই সমস্যা গুলির প্রতি ভারত সরকার, প্রশাসন এবং সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নিরসনের চেষ্টাও করেন তাঁর গল্পের মধ্যদিয়ে। শুধু 'অপারেশন? বসাইটুডু' নয় মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্রের গল্প গুলির প্রায় অধিকাংশ গল্পই এই অভিঘাতেই সৃষ্টি।

'জল' গল্পেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে চরসা গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের জলের সমস্যাকে নিয়ে একচরম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খরার দিনে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত পায় না মঘাইরা, আবার বর্ষার দিনে জলের বন্যার জন্য এলাকায় বসবাস করাই সমস্যাকর ব্যপার হয়ে দাঁড়ায়। আবার এই সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষেরা একজোট হয়ে মিলে ঝুলে নিজের সমস্যার সমাধান করতেও জানে।

> "সেবার জল সরে যাবার পর শরতে মঘাইরা সকলে ঠিক করে বন্যা ঠেকাতে গ্রামের পশ্চিম দিকে পাড় দিবে। তখনই শুরু হয় মাটিতে বাঁধ বা পাহাড় তোলার কাজ। কার্তিক থেকে চৈত্র অব্দি কাজ চলে। বৈশাখ-জৈষ্ঠে পাহাড় শুকোয়। বর্ষায় যে মাটি গলে, তাচাপা দেওয়া হয় শরতে। ক্রমে পাহাড়ের মাটি শুকিয়ে পাথরের মত হয়েছে। এখন আর বর্ষায় মাটি গলে না।"[৪৫]

এই বাঁধের জন্য যে স্থান থেকে মাটি কাটা হয় সেখানে ডোবার সৃষ্টি হয়। যতদিন এই ডোবায় জল থাকে ততদিন এই ডোবা থেকেই মঘাইরা নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। গ্রামে বৈষম্যের চেহারা স্পষ্ট। এখানকার নিম্নশ্রেণির মানুষের সন্তানেরা সরকারী প্রাথমিক

স্কুলে একদিন যদি আসে তো বাকি দশদিন ছাগল চড়ায়, জ্বালানি কুড়োয় পানীয় জল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। আর উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মনেরা ব্লকের ভালোদামি স্কুলে নিজের সন্তানদের ভর্তি করিয়ে আসে, যার ফলে এদের এই স্কুলের প্রয়োজন হয় না। সাধারণ নিম্নশ্রেণির মঘাইদের গ্রামের পঞ্চায়েতি কুঁয়োর জল নিতে দেয় না, নিচু জাতের মানুষ বলে। আর এরাও নিজেরা নিজের জাতটাকে নিচুবলে মেনে নেয়। কেননা এরা কখনো কনোদিন এই গ্রামের বাইরে পা রাখেনি। এরা জন্মগত ভাবে অনুন্নত, এদের না অছে শিক্ষা, না অছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, তাইতো এরা শুধুমাত্র কর্মেই বিশ্বাসী। অথচ গ্রামে রিলিফ আসে। পঞ্চায়েতি কুঁয়ো আসে মজুরির দানসত্য সাপেক্ষ হলেও সন্তোষের মতো উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা বাইরের থেকে মজুর আনে আর তাতে গ্রামবাসিরা হয় কর্মের থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে কুঁয়োও দখল করে নেয় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা। অথচ সংবাদ প্রচারে জানানো হয়, 'পশ্চিমবঙ্গে হরিজন নির্যাতন নেই। জাত বিষয়ে সহিষ্ণুতা আছে।' অথচ নিম্নশ্রেণির মানুষদের জন্য সরকারী কৃষি লোনের ব্যবস্থা করলেও সরকারী লোন এরা কখনো পায় না। এরা পায় সন্তোষ পুজারির মতো লোকেদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুদে আলাদা আর এক লোন। মহাজন, জোতদারেরা ধারদেয় কিন্তু সরকারী খাতায় তার কোন রেকর্ড থাকেনা। অথচ অশিক্ষিত, গেয়, অজানা মানুষের হাতের টিপ ছাপ নিতে কখনো ভুল করেনা। এই শ্রেণির মানুষেরা বিভিন্ন দিক দিয়ে শোষিত হয়। তাই তো জিতেন মাইতি আকিম কে জানায়,

> "এটা অন্ধ্র বা অন্য রাজ্য নয়, তাই হরিজন নিপীড়ন চলছে বলা যায় না। অথচ তাই চলছে। আপনাদের নিস্ক্রিয়তা সন্তোষ পুজারীকে মদত জোগাচ্ছে। .....সন্তোষ পুজারী ব্লকের সবচেয়ে প্রভাব শালী ব্যক্তি। তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় বছরে ষাট হাজার টাকা। বহু জমি বেনামিতে সে ভোগ করে তার সম্পত্তি সোর্স বংশানুক্রমে প্রাপ্ত রিলিফ মানি।"[৪৬]

জিতেন মাইতির মতো সাধারণ সমাজ সেবীও স্কুল শিক্ষক এবং অন্যান্য মানব দরদী কোন ব্যক্তি এদের পাশে দাঁড়িয়ে কোন ভালো কিছু পরিকল্পনা করলে চলতে থাকে

এদের উপর নতুন নতুন চক্রান্ত;যাতে করে এরা বংশানু ক্রমেই একই পদ্ধতিতে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। হরিজনদের ঘরে ঘরে চোলাই মদ তৈরিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আবার মহাজনেরাই চোলাই মদের লাইসেন্স বানিয়ে মদ বিক্রি করে খোলা মার্কেটে। এদের পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে এদের কাছ থেকেই আদায় করে বাৎসরিক রিলিফ মানি।

একে তো এদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, তার উপরে যদি নিজেরা কোন উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা করে তা হলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রয়োজনে ভালো কাজে বাঁধা দেওয়ার জন্য সরকারী পুলিশের সহযোগিতা পর্যন্ত গ্রহন করে। এমনই ঘটনা ঘটেছে চরসার বুকে দুইদিকে বাঁধ নির্মান করে মঘাইরা যখন তাদের সারা বৎসরের জলের অভাব দূর করার চেষ্টা করে এবং কোন এক সময় যখন এই পরিকল্পনায় সফলও হয়। সরকারী অনুমোদন ও মহাজনদের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র নিজেদের শ্রমের দ্বারা তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই উচ্চ শ্রেণির মহাজনেরা, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকারের পুলিশ বাহিনী। অহেতুক ভাবেই শয়তানি রাজনৈতিক শোষণ চালানো হয় এই হরিজনদের উপর, অযথা অপরাধী বানানো হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে। তৎসঙ্গে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় এদের এতদিনের কায়িক পরিশ্রমের ফসল নদীর বাঁধকে যা এদের কাছে মায়ের সমান। যাদের দ্বারা মুজুরেরা নিশ্চিন্তভাবে ফসল ফলাতে পারবে। পরিপুষ্ট ধান উৎপাদন করতে পারবে। খাবার জলের জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পাড়বে। অহেতুক ভাবে অকারণে ফাঁসানো হয় প্রাইমারী স্কুলের সমাজ সেবী শিক্ষক জিতেন মাইতিকে, ধরাকে এবং মঘাইকে। গল্পে গল্পকারের বর্ণনাটি ছিল এরকম,

> “চরসা ব্লকে কাজ নিয়ে আসার পিছনে জিতেন মাইতির গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ পায়। জল একটি ঈস্যু মাত্র, এ গ্রামে তিনি মঘাই ডোমের সঙ্গে যেরকম তৎপরতায় যোগাযোগ করেন তাতে বোঝাযায় সাক্ষাৎকার পূর্ব পরিকল্পিত। মঘাই ডোম ও ধুরা ডোম’ফোর লং সাসপিশাস ক্যারেকটার’। কেননা একাত্তর সালে তারা তিনজন পলাতক

সন্ত্রাসবাদী চরম পন্থাকে মদত দেয় বলে জানা গেছে এবং প্রমান অভাবে তাদের সামিল করা যায়নি। জিতেন মাইতি জলের ছলে মঘাই ও ধুরাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাজে লিপ্ত।

পুলিশি সূত্রে খবর আছে। চরসা গ্রামের অবস্থা বিস্ফোরক। জল একটি ইস্যুমাত্র। জলকে কেন্দ্র করে যে-কোনদিন গ্রামের সংরক্ষিত ও তপসিলি জন সমূহ এক বিস্ফোরণে ফেটে পরতে পারে। বস্তুত এই বর্ষাসিঞ্চনে সরসা-শ্যামলা চরসা এক জতুগৃহ। যেকোন সময়ে ....

'আইন ভঙ্গের সকল সন্ত্রাসী চেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ....

পুলিশ কেন, পুলিশ কি করতে পারে তা কেউ বোঝার আগেই বাঁধের পাঁছ-মুখের ও আগ-মুখের পাথর ফেলে দিতে থাকে পুলিশ।' দিস উই ক্যান্ট ডু' বলে জল থেকে হাত বাড়িয়ে পুলিশের ঠ্যাং ধরে টান মারেন জিতেন মাইতি। ফলে মাথায় বাড়ি পড়ে ও তার বগলের নিচে হাত দিয়ে টেনে পাড়ে তুলে তাকে লাথ মারে আর এক পুলিশ।"[৪৭]

বাঁধ ভাঙতে বাধা দেওয়ায় মঘাইয়ের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে। জিতেন মাইতি ও ধুরা আই. পি. সি ১৪৭, ১৪৭ ও ১৫১ নং ধারা অনুযায়ী জেলে বসবাস। চরসা নদী আবার আগের মতোই পাষাণ অভিশপ্ত, বর্ষায় জলে জলাঞ্জলী, খড়ায় শুকনো। বুনিয়াদী স্কুল নেই। এখানকার অধিবাসীরা রাতে রাতে উনুই খোঁড়ে। সেখানে জল জমে এবং সকালে তা ঘরে নিয়ে আসে। অথচ সরকারী নোট,

> "চরসা ব্লকে হরিজন–সমস্যা জাতীয় কোন সমস্যা নেই। জল –সমস্যাও নেই। জল, দরভিসন্ধি অ্যাজিটেটরদের তৈরী একটি'ঈস্যুমাত্র।"[৪৮]

মহাশ্বেতা দেবী এভাবে হরিজন সম্প্রদায়ের দু:খ- দুর্দশার কথা তাদের এই পরিস্থিতির প্রতিকারের কথা জানিয়ে রচনা করেন 'জল'গল্পটি, শুধু যে গল্প রচনা তা নয় ব্যক্তিগত জীবনেও মহাশ্বেতা এই সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদের জন্য সমাজ কল্যান দপ্তর তৈরি করেছেন। যেমন, ১. পশ্চিমবঙ্গ হরিজন কল্যান সমিতি, (কাঁচরা পাড়া)। ২. আদিবাসী ও হরিজন কল্যান সমিতি, ৩. চব্বিশ পরগনা আদিবাসী কল্যান সমিতি, ৪. পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যান সমিতি (মেদিনী পুর/পুরুলিয়া) প্রভৃতি এগুলি ছাড়াও আরও অনেক সমাজ কল্যান মূলক দপ্তর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটিং করে কমিটি তৈরিকরে এবং অনেক সংস্থার রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার পর্যন্ত বের করে দিয়েছেন। যার ফল স্বরূপ অনেক জায়গায় এর উপকারিতাও অনুভব করেছেন সাধারণ মজুর ও কৃষক শ্রেণির মানুষেরা। আর এর ফল স্বরূপই মহাশ্বেতা এদের কাছে হয়ে ওঠেন অতি আপন মানুষ। কারোকাছে মারাঙদাউ, কারো কাছে আজিম, কারোকাছে বড়দিদি। কেন এই সর্বোহারা নিরন্ন নেংটে শ্রেণির মানুষদের অন্ন–জল–ভূমি-বাসস্থান–শিক্ষা–চিকিৎসা এবং জীবিকার কথাই শুধু ভাবেননি। মহাশ্বেতা যেন নিজের জীবনকেই উৎসর্গ করে দিয়েছেন এই শ্রেণির মানুষদের জন্য। আর এর ফল স্বরূপই আমরা তার সাহিত্যে আদিবাসী, অন্তেবাসী, বঞ্চিতদের জীবন যাত্রাকেই শুধু লক্ষ করি না, লক্ষ করতে পারি তাদের গোটা সমাজের পূর্ণ চিত্র কে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের সহায় সম্বল হীন দু:খের শরিকই নন মহাশ্বেতা যেন তাদের দু:খেরই ভাগিদার।

'এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ' গল্পেও আদিবাসী সমাজকে দেখানো হয়। তাদের সমস্যা, গৌর লস্করদের মহাজনত্ব, ছিয়াত্তরের এম. ডব্লু থেকে বঞ্চিত মজুর শ্রেণি। এদের বিরুদ্ধে মহাজনি ষড়যন্ত্র আন্দোলন, বিদ্রোহ এবং লখিন্দ ও বসাই টুডুর মৃত্যু এবং উত্তরোত্তর

জমিদারী শোষণ, পুলিশি অত্যাচার, সরকারী দমন পীড়ন নীতি আজও বর্তমান। একারনেই ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা।

> "৭ই মার্চ ২০১১-এ নয়াদিল্লীতে গৃহ ও নগর দূরীকরণ বিষয়ক মন্ত্রী কুমার সোলজা এক লিখিত বিবৃতিতে জানান বিগত ১০ বছরে ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বেড়েছে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ২০১২ সালে দেশে গরীবের সংখ্যা দাঁড়াবে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ। যেখানে ২০০১ সালে ঐ সংখ্যাছিল সাতকোটি পাঁচলক্ষের কিছু বেশি।"[৪৯]

সমাজ বিবর্তনের পরেও সমাজের এই সামাজিক সমস্যা গুলির সমাধান না করলে হত দারিদ্রের সংখ্যা কোন এক সময় চরমে পৌঁছোবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মহাশ্বেতা দেবী দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের খাদ্যের, পানীয় জলের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা নিয়ে বহু গল্প রচনা করেছেন। তাদের বঞ্চনার, শোষণের, নিগ্রহের কারণ ও মুক্তির দিশারী হয়েছেন, 'মৃত্যুর কারণ', 'যমুনাবতীর মা', 'দাহ', 'সন্দেশ', 'শিশু', 'নুন', 'মাছ', 'জল', 'বান', 'কুড়োনির বেটা', 'ভাত', 'অন্ন অরণ্য অন্ন অরন্য', 'ভাতুয়া', 'জাতুধান', 'সাঁঝ সকালের মা', 'শনিচরী', 'রুদালী', 'বিছন' প্রভৃতি গল্পে।

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ও গল্প গুলিকে নিবিড় ভাবে পাঠ করলে দেখা যায় বার বার উঠে আসে 'the voiceless section of Indian society'র কথা। কেননা মহাশ্বেতা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুভব করেছেন এই অনুন্নত সমাজের কথা। গোটা ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছেন এই দারিদ্র শ্রেণির মধ্যে এবং তা খুঁজেও পেয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,

> "..... আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি the voiceless section of Indian society. এইঅংশতখনওশুধুনিরক্ষর, স্বল্পসাক্ষর ওঅনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড় বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না। আমি পারি কিনা জানিনা, চেষ্টা করি মাত্র।"[৫০]

আর এই চেষ্টার ফলে অন্ত্যজ শ্রেণি যারা ভারতের সন্তান হয়েও উপেক্ষিত থাকে তাদের জীবনচর্যায় ইতিহাসের প্রচলিত ছক ভেঙে গিয়ে নির্মিত হয় একটি নব্য ধারা। যে ইতিহাসে থাকে মানুষ এবং এই মানুষের বর্তমান অবস্থার শিকড়ের অনুসন্ধান। আর যা বর্তমান বলে মনে করি কাল তা কালের প্রবাহে অতীত হয়ে যায়। আর সে কারনেই আজকের বর্তমানের জন্য অতীত ইতিহাস হয়ে ওঠে অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। মহাশ্বেতা এই কারনেই অতীত ইতিহাস থেকে আরও অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধানে চলে যান। কেননা মহাশ্বেতা জানেন যে সময় এবং ইতিহাস একই স্রোতের অনুকূলে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হওয়া দুটি বিষয়। একের পরিবর্তনে অপরের পরিবর্তন অতি আবশ্যিক হয়ে পরে। তাইতো মহাশ্বেতার কাছে কখনো ইতিহাস হয়ে ওঠে চর্চার বিষয়। আবার কখনো চর্চার বিষয় হয়ে পরে সময়। সমাজ সম্পর্কে সচেতন ও দায়বদ্ধ শিল্পী মহাশ্বেতার নিজের বিশ্লেষণই উঠে আসে সেই বিষয়,

> "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায় বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা আমার মতে একমাত্র সেভাবেই বৃহত্তর উত্তরণ সম্ভব, আরও মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে। আমি বিশ্বাস করি গন ও সমাজ জীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্চায়। ইতিহাস চর্চা আমার মতে, সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূল শিক্ষা।"[৫১]

আর সে কারনেই মহাশ্বেতার কী গল্প কী উপন্যাস কোনটিই বিচ্ছিন্ন নয় একটি অখন্ড ও নির্দিষ্ট লক্ষের দিকেই এগিয়ে চলে মহাশ্বেতার সাহিত্য বিশ্ব। শোষণ, নির্যাতন, প্রশাসনের মানুষ মারা খেলা, অরণ্য, অরণ্য প্রাণী, অরন্য সন্তানদের মুছে ফেলা, সংস্কারের দাসত্ব, নারীর অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ই হয়ে উঠে তার মূল লক্ষ। পাশাপাশি এই সমস্যা সমাধানের ঈঙ্গিতও দেন পাঠক কে। মহাশ্বেতার কাছে অতীত অতি মূল্যবান হয়ে দেখা দেয়। কেননা তিনি লিখন প্রক্রিয়াকে জাগিয়ে রাখার জন্য অতীতের ব্যবহার করেণ। কেননা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আসলে বিকল্প চেতনা, বিকল্প নন্দন, বিকল্প জীবন, বিকল্প বয়ানের আশ্রয়। এবং ইতিহাস, ইতিহাস চর্চা তাঁর কাছে পুনরাবিস্কার ও পুনর্নির্মানের প্রতিশ্রুতি। আর যে কারনেই বিনা প্রশ্নে এবং বিনা পরীক্ষায় ইতিহাসকে গ্রহন করেন না। তাই বিনির্মিত চেতনার নির্যাসের মধ্যদিয়ে তৈরি করেন আর এক ইতিহাস। মহাশ্বেতা নিজেও একই কথা বলেছেন খানিকটা অন্যভাবে, -

> "আমার প্রতিটি লেখাতেই আমি তখনই প্রতিবাদকে বক্তব্য করে তুলি, যখন প্রতিবাদের প্রেমিস থেকে উর্ধ্বতর, আরও প্রয়োজনীয় কোন প্রেমিসে উত্তরণ সূচিত করতে পারি।"[৫২]

তিনি আরও বলেন,

> "সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদন্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময়ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোন লেখকেরই মূল্যায়ন করা যায় না।"[৫৩]

আর সে জন্যে মহাশ্বেতা এই সময়ের সাহিত্য রচনার জন্যেও খুঁজে ফেরেন কয়েকশো বছরের পুরণো ইতিহাসকে। তিনি অনুভব করেন গ্রন্থে গ্রথিত ইতিহাসই মূল ইতিহাস নয়, এর বাইরেও অন্য এক বাস্তব ইতিহাস চলতে থাকে লোকের মুখে মুখে ধারা বাহিক ভাবে বংশানুক্রমে। আর এই কারণেই 'ঝাঁসিরাণী' রচনার সময় চাঁরশো পাতার

লেখাকে ছিঁড়ে ফেলে যাত্রা করেন ঝাঁসি অভিমুখে মহাশ্বেতা নিজেই স্বীকার করেছেন সে কথা,

> "লিখে ফেললাম চাঁরশো পাতা। তারপর পড়ি আর পড়ি। মন ভরে না। একদিন চাঁরশো পাতাই ছিঁড়ে ফেললাম। বিজনকে বললাম। আমাকে যেতে হবে। স্বচক্ষে দেখতে হবে সে সব জায়গা। .....কোথায় কার বাড়ি থাকব, এসব না জেনেই রওনা হয়ে যাই। বয়স সাতাশ কি আটাশ হবে। এক হাতে বালা, একহাতে ঘড়ি, ক্ষেপা জেদে রেলে চাপলাম।"[৫৪]

লেখিকা তাঁর 'ঝাঁসিরানী' উপন্যাসে মানবিক আকাঙ্খার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আর সেই কারণেই ঝাঁসিতে ঘুরে লোককথা, লোকগাথা, লোকগীতি সংগ্রহ করেন। এবং তা জানাতে কোন দ্বিধা করেন না।

> "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সরাসরি ব্যাবহার করিনা। আমাকে লেখার জন্য ম্যাপ, দলিল, পুথি, ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। ঝাঁসিরানি লেখার জন্য বুন্দেল খন্ডী, মারাঠি, মোড়ি হরফে লেখা প্রাচীন মারাঠী জানতে হয়। ঘুরতে হয় বুন্দেল খন্ডে মানসিংহ যখন প্রতিপত্তির শিখরে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, চেনামানুষ, জানা জীবন আমার সাহিত্যে, বিবেচনাযোগ্য বই গুলিতে ও লেখায় এসব কমই স্বাক্ষর রয়েছে। অভিজ্ঞতা বিষয় বস্তু–বক্তব্য–ভাষা–গদ্য রীতি, সব গুলিকে নিরন্তর প্রসেসিং করতে হয়। তবে ঘটে শিল্পিত করণ – তারপর লিখি। এই প্রসেসিং ও শিল্পিত করণের কাজে আমি বিশ্বাসী।"[৫৫]

মহাশ্বেতা দেবী অধিকাংশ লেখাতেই আমরা বাস্তবসময় ও সমাজের দলিলী করণের নীতিকেই লক্ষ করেছি। তবে মহাশ্বেতার বিকল্প ইতিহাস গড়ার পূর্ণ প্রয়াস লক্ষ করা যায় সত্তরের দশক থেকে। এই সময়ের রচিত ছোটগল্প ও বড়গল্প গুলি ঐতিহাসিক দলিল রচনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর এই সময়ের রচনা বিখ্যাত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭)। ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ, এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মিতা এবং অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের জন্যপ্রতিবাদী বিবেকই তাঁকে 'অরণ্যের অধিকার' রচনা করতে বাধ্য করে। আখ্যানের শুরুতে জানিয়ে দেন,

> "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসা মুন্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরনীয় ও তাৎপর্যময়। এদেশের যে সামাজিক ও অর্থনীতির পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবল মাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এই বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুন্ডা ও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।
>
> লেখক হিসেবে, সমকালিন সামাজিক মানুষ হিসেবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায় দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকার বদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনো ক্ষমা করেনা। আমার বীরসা-কেন্দ্রিক উপন্যাস – সে অঙ্গীকারেরই ফল শ্রুতি।"[৫৬]

মহাশ্বেতা জানিয়ে দেন তিনি প্রকৃত ইতিহাস রচনাতে বদ্ধ পরিকর। আর সে কারনেই রচনা করেন বিপ্লবী বীরসার নেতৃত্বাধীনের মুন্ডাদের জাগরনের প্রকৃত ইতিহাসকে। এখানে মহাশ্বেতা যে কল্পনার আশ্রয় একেবারেই নেন নি তা নয়। ঐতিহাসিক সত্যকে আখ্যানে প্রস্ফুটিত করার জন্য যতটুকু কল্পনার দরকার ঠিক ততটুকুই

তিনি গ্রহন করেছেন। ছোটনাগপুর অঞ্চলের, জল, মাটি, জঙ্গল, দিকুদের অত্যাচার, শোষণ এবং দিকুদের বিরুদ্ধে বীরসার ঊলগুলানের ডাক প্রভৃতিকে মহাশ্বেতা যথাযথ ভাবে তুলে ধরেন 'অরণ্যের অধিকারে'। এই উপন্যাসে রচিত হয়েছে শোষিত মানুষের বিপ্লবী স্লোগান 'ঊলগুলানের শেষ নাই। বীরসা মুণ্ডার মরণ নাই।' অর্থাৎ যতদিন শোষণ, নির্যাতন, ক্ষমতার নীতি প্রচলিত থাকবে ততদিনই বীরসা জীবিত থাকবে হাজার হাজার যুব নেতার মধ্যে। বীরসা যেন আর একক সত্তা থাকে না, তার কণ্ঠের বীরত্বব্যঞ্জক ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে সমস্ত সাধারণ আন্দোলিত মানুষের স্বরের ঘোষণা।এই বার্তাই মহাশ্বেতা জানিয়েদেন দূরদূরান্তে আকাশে বাতাসে শুধু যে'অরণ্যের অধিকার'ই মহাশ্বেতা ইতিহাসের স্বতন্ত্র বর্ণনা করেছেন তা নয়। এছাড়াও, 'নটী', 'মধুরে মধুর', 'তিমির লগন', 'এতটুকু আশা', 'প্রেম তারা', 'পরম পিপাসা', 'তারার আধার', 'আধার মানিক', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'হাজার চুরাশির মা', 'চোট্টি মুন্ডা এবং তাঁর তীর', 'শ্রী শ্রী গনেষ মহিমা', 'তিতুমীর', 'স্বেচ্ছা সৈনিক', 'ক্ষুধা', 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে মহাশ্বেতা বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ধরণ কে পাঠক বর্গের কাছে তুলে ধরেন স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যদিয়ে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং নান্দনিকতার দিক থেকে তাঁর ছোটগল্প গুলি যেন সমাজ বাস্তবতার এবং সাংস্কৃতিক দলিল নির্মানের এক অভিনব পদক্ষেপ। সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সচেতন লেখিকা মহাশ্বেতার কাছে সম্ভবত সময়ের আবহে উপন্যাসকে অতিক্রম করে ছোটগল্পের নিটল অবয়বে এবং এক মুখীন তীব্রতায় মানবিক আবেদনকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি বোধহয় যে পরিমান উপন্যাস রচনা করেছেন তার থেকে কয়েক গুন অধিক পরিমানে রচনা করেছেন ছোটগল্প ও বড়গল্প। ১৯৫৩ সালে Minimum wage ন্যুনতম মুজুরি আইন তৈরি হয়। ১৯৫৯এ রিভিশন হয় এবং ১৯৬৮তে পুন:পরিবর্তন হয়। ১৯৭৪ সালে সরকার আবার এই আইনকে সংশোধন করেন। তথাপি সত্তরের দশকেও আদিবাসী নিম্নশ্রেণির শ্রমিকেরা এই রেট থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। এই বাস্তব সমস্যাকে মহাশ্বেতা 'অপারেশন? বসাই টুডু' তে উল্লেখ করেছেন। তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পের চরিত্র গুলিকে

ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উপস্থাপিত করেছেন। 'রোমথা' তাঁর এরকমই একটি রচনা। দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজা লক্ষন সেনের আমলের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত আসামী ও রাজ বৈদ্যের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রসারকে নিয়ে গল্পটি রচিত। এই গল্পের মধ্যদিয়ে পাঠকবর্গ অনায়াসে অনুভব করতে পারে যে ঐ সময়ের রাজ্য শাসন, সমাজচিত্র, নারীর স্থান এবং রাজসৈন্যের ক্ষমতা বা প্রতাপ কতটা উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তৎসঙ্গে রাজ বৈদ্যের ব্যবসা বানিজ্য বিস্তার পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা অবগত হতে পারি।

গল্পের শুরুতেই মহাশ্বেতা প্রাকৃতিক বৈচিত্রের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন রোম্যান্টিক গল্পকারের মতো,

> "হেমন্তের অপরাহ্ন। এমন অপরাহ্নে ভাগিরথির দুইকূল পাকাধানের গন্ধে মন্থর, সুরভিত। চারিদিকে শুধু অবারিত ধানক্ষেত, মাচায় বসে চাষির ছেলে পাখি ও হরিণ তাড়ায়। গাছের পাতা স্বর্ণাভ, উজ্জ্বল। বিচিত্র বর্ণ প্রজাপতি ও পতঙ্গ পাখার শব্দে বাতান মঞ্জুরিত করে। ধান কাটা এখনো শুরু হয়নি। শস্যক্ষেত্রকে মনে হয় কোন সুখ শয্যা, সেখানে কোন সুলক্ষনা গৃহস্থবধু, পূর্ণগর্ভা, আলস্যে, আবেশে, মন্থর প্রতীক্ষায় দেহ বিছিয়ে রেখেছে।"[৫৭]

এই অব্দি পাঠ করলে যে কোন সাধারণ পাঠকেরই মনে হবে যে এই গল্প বোধহয় কোন রোম্যান্টিক প্রেমের কাহিনি হবে, এসব গল্পে নেই তাও নয়। শুধুমাত্র সামাজিক খলনায়কের কারনে গল্পের ক্লাইম্যাক্স পরিনত হয় ট্র্যাজেডিতে। গল্পের নায়ক শরণ পতিতা বৃত্তিকারী বারাঙ্গনা চন্দ্রাবলীকে ভালোবাসে। একের প্রতি অপরের গভীর আত্ম বিশ্বাস, প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা প্রভৃতি পারিপাঠট্যে ঘেরা। চন্দ্রাবলী শরনের প্রেমে পরার পর থেকে আর অন্যকোনো পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় না। কেননা তারা একে

অপরের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চন্দ্রবলী তার জীবনের সব কিছুকে সংযত করে রাখলেও নগড়ের রক্ষি গোপালকে সে না করতে পারেনা। কেননা গোপাল বাইরের দিক থেকে নগরের রক্ষি হলেও ভিতরের দিক থেকে সে এই নগরের সমস্ত অসহায় নারীর জন্য একজন আস্ত ভিলেন। তার প্রতি বিরূপ হয়ে কোন বারাঙ্গনা নগরে বাসা করতে পারে না। আর এই রীতিই চন্দ্রাবলীকে সুলভ করে দেয় গোপালের কাছে। এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে শরণ চন্দ্রাবলীর গলা টিপে ধরে হত্যাকরে এবং পরিকল্পনা করে নিজেকেও শেষ করে দেওয়ার। কিন্তু শরণ ধরাপরে রাজ সৈনিকের হাতে এবং তার মৃত্যু দন্ড হয়। শরণ নিজে মরতেই তো চেয়েছে কেন সে অপরাধী এবং সে অপরাধ নিজে স্বীকার ও করেছে কেননা সে তার সব চেয়ে প্রিয় মানুষটিকে খুন করেছে।

কিন্তু মৃত্যুদন্ডাদেশের পরক্ষনেই শরন সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শরন এখন মৃত্যুকে ভয় পায়, সে বাঁচতে চায়। কেননা তার উপর যে শাস্তি আরোপ করা হয়েছে তার নাম 'রোমথা'। এই খানেই রয়েছে রাজ বৈদ্যের চক্রান্ত ও রাজার কূটনৈতিক চাল শাস্তিপ্রদান রীতি নামে। কেননা গৌড়েশ্বর এখানে এমন একটা শাস্তি প্রদান রীতি তৈরি করেছেন যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। অর্থাৎ গৌড়ের রাজ্যে মৃত্যু দন্ড প্রাপ্ত আসামীর মৃত্যু হবে আবার ঐ মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে মহামাস তেল ও মহামাস ঘৃত তৈরী হবে। একে মৃত্যু, অপরদিকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে ঘি ও তেল। যা দিয়ে রাজ অর্থ উপার্জন হবে। এবং রাজা হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক দিক থেকে বলিয়ান। এই প্রথার নিয়ম হল,

> "রোমথা শব্দটি কণ্ঠনালী ও বুকের মাঝি জায়গায় লোহার শোলাতাতিয়ে দেগে দেওয়া হয়। দেগে দেওয়ার পর মানুষের মনথেকে বাঁচবার ভরসা চলে যায়।"[৫৮]

তারপর শুভদিন দেখে রোমথাকে জনসমারহে তপ্ত তেলে ফেলেদিয়ে তাকে ভাজা হয়। জীবন্ত রোমথাকে ভেজে যে তেল প্রস্তুত হয় তাই মহামাস তৈল। ৫২৭ বঙ্গাব্দের

জীবন্ত ঘটনাকে মহাশ্বেতা তাঁর'রোমথা'গল্পে যেন নতুন করে প্রান ফিরিয়ে দিলেন রোমথা প্রথার আলোচনা করে। কেননা ঐ সময়ে দ্বিতীয় লক্ষন সেনের গৌড়দেশে বৈদ্য সমাজের প্রতাপ ছিল সাংঘাতিক এবং বড়ই অমানবিক। কেননা স্বয়ং গৌড়েশ্বর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নতি কল্পে লক্ষ কাহন সোনা ব্যয় করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আর সেকারনেই রাজা জানিয়ে দেন,

> "প্রান দন্ডে দন্ডিত বন্দীদের মধ্যে থেকে বৈদ্যরা মানুষ বেছে নেবেন। বন্দীর গায়ে লিখে দেওয়া হবে 'রোমথা'। সেই বন্দিকে বৈদ্যরা ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।"[৫৯]

গল্পে তেমন কোন প্রতিবাদ নেই, সংগ্রাম নেই, শ্রেণি বিভাজন এই গল্পে খুববেশি পরিলক্ষিত হয় না। তবে মহাশ্বেতা দেবী নিজেই প্রতিবাদের একটা হালকা অবয়ব তৈরী করেছেন কিছু মূল্যবান বক্তব্যের মধ্যদিয়ে।

> "রাজা বুঝিয়ে দিলেন তিনি ঈশ্বর নন, তিনি মানুষের প্রকৃত প্রভু। জন্মের সময় থেকেই মৃত্যুর কথাটি ঈশ্বর মেপে দেন, যে মৃত্যু স্বাভাবিক।
>
> যেমন নিয়মে গাছ মরে, নদী শুকোয়, অরণ্যের হাতি নির্জনে গিয়ে শেষ নি:শ্বাস ফেলে, ঈশ্বরের নিয়মে কোন অস্বাভাবিকতা নেই।
>
> অস্বাভাবিকতা মাত্রই মানুষের সৃষ্ট। মানুষ স্বাভাবিক কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা। এ পৃথিবীতে মানুষের জয়যুক্ত হবার কারণটি তাই। ঈশ্বর – সৃষ্ট পৃথিবীর সকল স্বাভাবিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। অরণ্যের জায়গায় নগর বসিয়েছে, সমুদ্রকে নৌকো দিয়ে

জয় করেছে, বন্যা, দাবানল, প্রতিটি আক্রোশের বিরুদ্ধে বাঁচাবার উপায় তৈরি করেছে। অস্বাভাবিক নিয়ম যা, তাও মানুষেরই সৃষ্ট। ঈশ্বরের পৃথিবীতে বহু পাপি তাপি, বহু রুগ্ন, অকর্মণ্য বাঁচতে পারে, সকলেরই জায়গা হয়।

মানুষের পৃথিবীতে পাপিকে শূল দন্ডে মরতে হয়, রুগ্ন ও অকর্মন্যকে অনাহারে অবহেলায় মরতে হয়, এক জনের শ্রমের ফলে আর একজন গৌড় নগরিতে জয় স্তম্ভ তোলে। মানুষের সৃষ্ট পৃথীবীতে তাই, রাজার কথাই যে শেষ কথা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

তাই গৌড়েশ্বর লক্ষন সেন, তার সিংহাসন থেকে আদেশ জানালেন, এখন থেকে বৈদ্যগন, তাঁদের প্রয়োজন হলেই কারাগার থেকে বন্দিদের যাকে ইচ্ছে বেছে নিতে পারবেন।”[৬০]

মহাশ্বেতা দেখাতে চেয়েছেন রাজার দু:শাসন কতটা এক পেশে ছিল। প্রজারা না থাকলে রাজার নগরে উঁচু উঁচু স্তম্ভ নির্মানে ব্যঘাত ঘটত। এদের দেওয়া কর থেকে নির্মান হয় রাজ নগর, রাজ বাড়ি এমন কি এরাই নির্মাণ করবে একজন স্বাধারণ মানুষকে রাজা রূপে। অথচ এই নিম্নশ্রেণির মানুষের পাপ পূণ্য, অপরাধ, শাস্তি, এসব বিষয়েরই একমাত্র অধিপতি হন রাজা গৌড়েশ্বর। তাঁর আনন্দ, জয় লাভ, অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপরেই নির্ভর করে রাজ বন্দীর মুক্তি এবং জেল হাজতের সময় সীমা। তার উপর আবার রাজনীতির প্রয়োগ করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। আর এই সুকৌশলী রাজনীতির কারনেই শরনের রোমথায় পরিনত হওয়া।

কিন্তু শরন আর মরতে চায় না বাঁচতে চায়। তাইতো রাজ বৈদ্যের রাখা সৈনিকের মাথায় আঘাত কতে মেরে ফেলে। বৈদ্য চন্দ্র সেনের কন্যা সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় উঠে পালিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শরন তাকে সঙ্গে নেয়নি। একা পালিয়ে যায় অনেক দূরে নদীর ঘাটে। সেখানেই ঘাটের মাঝিকে হত্যা করে। এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্য বরণ করে। তথাপি 'রোমথা' কে স্বীকার করে নেয়নি। অথচ নিজের শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুই কামনা করেছিল শরন।

> "সে হাতির পায়ের নিচে পড়ে মরতে প্রস্তুত ছিল। আগুনে পুড়েমরতে আপত্তি ছিলনা, জহ্লাদকে বলেছিল 'আমার হাত পা একটা একটা করে কাটতে পার? সেই মতো যন্ত্রনা পেলে তবেযদি আমার পাপের যোগ্য শাস্তি হয়।"[৬১]

কিন্তু তবুও সে রাজার প্রচলিত শোষণের কৌশলকে মেনে নিয়ে মরতে চায়নি। বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী শরনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। প্রচলিত 'রোমথা' প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। মৃত্যু সে তো এক রকমভাবে হলেই হল, শরন কিন্তু তা করেনি, লড়াই করে মৃত্যু বরণ করেছে অথচ আত্মসমর্পন করেনি। রাজা বা রাজার বৈদ্যের কাছে। এবং সর্বোপরি একথাও বলতে হয় যে দ্বাদশ শতাব্দীর কাহিনিকে মহাশ্বেতা সম্পূর্ন নিজের মতো করে কাহিনি নির্মান করে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাস সচেতন শিল্পি মহাশ্বেতা এভাবেই সময়কে দলিলী করণের মধ্যদিয়ে বন্দী করে রাখেন তাঁর গল্পের অন্তর্ভূবনে। এবং পাঠক বর্গের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর নান্দনিক বোধের সংগ্রামী প্রকাশ।

মহাশ্বেতা এই 'রোমথা'র অনুসন্ধান করেছেন দূর্গাচরনের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থ থেকে, মহাশ্বেতা তাঁর গল্পের শেষে তা স্বীকার করেছেন। "এই 'রোমথা' প্রথার উল্লেখ আমি দূর্গাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস বইয়ে পেয়েছি। লক্ষন সেনের আয়ুর্বেদ

প্রসারে উৎসাহ প্রসঙ্গে তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।"[৬২] নীহার রঞ্জন রায়ও সেন রাজাদের চরিত্র ও শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> "সেন রাষ্ট্র ও সেন রাজ সভার চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না। সভাকবি উমাপতি ধর এবং মহাধর্মাধক্ষ হলায়ুধ মিশ্র এই চরিত্র হীনতার দুইটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবগতির এই একই চিত্র–প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অ্ষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণ নগরে, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতায়, সে চিত্র সামাজিক দুর্নীতির, চারিত্রিক অবনতির, মেরুদন্ড বিহীন ব্যক্তিদের , কামপরায়ন বিলাস লীলার, শৃঙ্গার রসাবিষ্ট, অলংঙ্কার বহুল, মদির মধুর শিল্প ও সাহিত্যের, তরল রুচি ও দেহগত বিলাসের, অতি মাত্রায় ভেদ বৈষম্যের, ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত বিশ্বাস ঘাতকতার একাদশ দ্বাদশ শতকের রমাবতী, বিজয়পুর, নবদ্বীপেও সেই একই ছবি দেখিতেছি।"[৬৩]

আর একারনেই মহাশ্বেতা ইতিহাসকে দলিল বানিয়েই এগিয়ে চলেছেন তাঁর সাহিত্যকে নিয়ে। তাছাড়া মহাশ্বেতাও নিজেও বলেছেন,

> "আমি চিরকালই বিশ্বাস করেছি ইতিহাস। সমসাময়িক কালে যা ঘটে তা যেমন ইতিহাস প্রাচীন দিনের সময়ও কিন্তু ওয়াজ মাচ লাইক মডার্ণ টাইমস। প্রাচীন দিনেও সমাজ একই রকম ছিল। আর সমস্ত পুরান ঘাঁটলে বা ইতিহাস ঘাটলে যা সব পাওয়া যায়, দ্যাট মাস্ট বি সিন অ্যাট মডার্ণ টাইমস। আর যা যা দেখছি শ্রেণি শোষণ সেদিনও ছিল। এই যে বর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতো তাই একটা সমাজ

শ্রমিক হয়েই থাকবে। সে শুধু উৎপাদন করেই যাবে,
মুনাফা লুটবে অন্যরা। আজও ঠিক একই রকম আছে।”[৬৪]

আজও এই দৃষ্টিকোন সমাজে সত্যি অপরিবর্তনীয়। অন্তত শোষনের দিক থেকে তাই হাজার বছর পরেও শাসন তন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য প্রায় একই থেকে যায়। মানুষ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে কুণ্ঠিত তো হয়ই না উল্টো সীমাহীন বর্বরতার গর্বেগর্বিত হয়। আর এই বিষয় গুলোই মহাশ্বেতার সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বারংবার স্বতন্ত্র ধারায় ও স্বতন্ত্র মহিমায়। মহাশ্বেতার এরকমই আর একটি গল্প ‘মৌল অধিকার ও ভিখারী দুসাদ’ (১৯৭৯ খ্রি)।

এই গল্পে মহাশ্বেতা বাটাইদার দের ভাগিয়ারির সমস্যা মৌলিক অধিকার গুলির বর্ণনা করেছেন। এবং নিম্নশ্রেণির ভূমিহীন নিরন্ন নেংটে শ্রেণির মানুষদের কীভাবে উচ্চশ্রেণির মানুষেরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেয়, সে কথাই বর্ণনা করেছেন। তৎসঙ্গে উঠে আসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মে নিযুক্ত প্রশাসনের বর্বরতা ও ক্ষমতা প্রতাপ নীতির দ্বারা গরীবকে আরও গরীব ও ধনী মানুষকে আরও ধনী করে দেওয়ার রাস্তা সুগম করে দেয়। অর্থই যে অনর্থের মূলকারণ মহাশ্বেতা তা আমাদের ভিক্ষারী দুসাদের মধ্যদিয়ে জানিয়ে দেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় সংবিধানে কয়েকটি মৌলিক অধিকার নির্মিত হয়। আর এই অধিকারের মূল বিষয় হল নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার। আর সে কারনেই রাজা সাহেব, বা জমিদারের রাজার নিজস্ব জমির উপরদিয়ে বাসের রাস্থা ও রেল পথ নির্মানের জন্য যে জমি খাস করা হয়েছিল সে বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকাপান সরকারী তহবিল থেকে। আর সে কারনেই রাজা সাহেব খুশি এবং আনন্দিত হয়ে বোমা ফাটায়, ঘরে ঘরে দীপ জ্বালায় আর ওপর দিকে এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা চাষি, কৃষক, শ্রমিক এবং ভিক্ষারী তারা মৌলিক অধিকারের বিষয় সম্পর্কে বিন্দু মাত্র অবগত নয়। জানেনা কাকে বলে মৌলিক অধিকার, লেখাপড়া জানেনা, নিজের নামও লিখতে পারেনা। জানে শুধু কাজ করে খেয়ে পরে নিজে জীবনযাপন করতে। এরা রাজনীতি বুঝেনা আর

তাইতো সহজ সরল, সোজা সাপটা এবং ভীতুও। তবে এটুকু বুঝতে পারে যে, থানা, পুলিশ, সরকার এসবই জমিদার রাজা সাহেবের কথায় ওঠাবসা করে। মহাজনদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের একটা হাত রয়েছে। আর তাইতো বলতেও পারে,

> "মাস দশেক আগে রাজা সাহেবের জমির বাটাইদার চাষিদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এরকম গতবছর আষ্টেক হয়েছে। কোন বাড়েই পুলিশ বসে যায়নি এখানে। প্রথমে রাজার লোক বাটাইদারদের মেরেছে তারপর এসেছে পুলিশ। বাটাইদারদের মধ্যে যাদের মনে করেছে পালের গোদা, ধরে নিয়ে গেছে।"৬৫

তথাপি আন্দোলন থামতে পারেনি। আর পারবেই বা কেন? সরকারের শ্রমদপ্তরের নিয়ম মতো ভাগ চাওয়া আপরাধ নয়। তাই তো এদের শ্লোগান, 'মেহনত কা ফসলকা আধা বাট্টাপর হম লোগোকো মৌল অধিকার হ্যায়।' রাজা সাহেবের ভাগ চাষি এরা, এরা এদের মৌল অধিকারে নিজের পরিশ্রমে রাজা সাহেবের জমিতে ধান চাষ ও তার ভাগ চেয়েছে। এই ন্যায্য অধিকার চাওয়াটাই অপরাধ। সে কারনে ভাগচাষি চন্দন সিংকে মরতে হয় জমিদারের সেনার হাতে। এরকম আরও বহু ভাগ চাষিকে মরতে হয় মৌলিক অধিকার আদায় করার জন্য। মহাশ্বেতা এখানে একই সাথে দুটি পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন। এক. পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করে শুধু শোষিত জন, আর এক পৃথীবীতে বসবাস করে শুধু শাসক জন। যারা দারিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, তারা জন্ম সূত্রে এই স্থানের মানুষ। তাদের নিজস্ব জীবন যাপন এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম একই জীবন যাপনে বাধ্য। আর এক শ্রেণির মানুষ জন্মসূত্রে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। তারা শুধুমাত্র শাসন করার জন্য শোষন করার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। তাইতো নওয়া গড়ের রাজা সাহেব জন্ম সূত্রে জমিদার আর ভিক্ষারী জন্ম শুত্রেই ভিক্ষারী। এমনকি যারা এই বৃত্তিকে বঞ্চিত করতে চাইবে তাকে বাধ্য করা হবে তার ন্যায্য জীবন যাপন পদ্ধতিকে গ্রহন করতে। এ রকমই হয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র দুসাদের সঙ্গে।

দুসাদের পেশা ছাগল চড়ানো। সে ছাগলের পাল নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য নিরাপদ স্থানে ছাগল চড়ায়। ছাগল বড় হলে বিক্রি করে জীবন-যাপন করে। একে তো বনের বাঘ, শিয়াল, নেকড়ের সমস্যা রয়েছে উপরন্তু ঠকবাজ জোচ্চরদের অত্যাচার। তাই দুসাদ কোথাও স্থির থাকতে পারেনি নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। দুসাদরা নিচু জাতের মানুষ তারা কূঁয়োর জল খেতে পারে না। নালার জল খেয়ে জীবন যাপন করে। সে মাস্টার মশায় সুখ চাদের কাছে জানতে পারে মৌলিক অধিকার কী? সে বুঝতে পারে নিজের সম্পত্তি রক্ষার অধিকারই মৌলিক অধিকার আর সে কারনেই সে এখন আর কোন পুলিশ বা সরকারের মানুষ ও জমিদারকে পাঠা ছাগল খাওয়ার জন্য দিবে না। ভিক্ষারীর শত্রু যেমন শিয়াল, নেকড়ে, তেমনি তার আর এক শত্রু পুলিশ। কেননা পুলিশ যখন তখন এসে খাওয়ার উপযুক্ত যোদ্ধা পাঠা নিয়ে চলে যায়। নওয়া গড়ে একটি ভাঙা বাসের মধ্যে ভিক্ষারি বসবাস করা শুরু করে। কারণ এখানে পুলিশ ফারি নেই পুলিশ লাইন চলে গেছে আর সে কারনেই তার মোদ্ধা ছাগল নেওয়ার মতো আর কেই নেই। তাছারা ভিক্ষারী দুসাদ এখন জানে,

> "নিজের সম্পত্তির ওপর যে হোক, এর নাম ভারতীয় সংবিধানে এক মৌল অধিকার। মৌল অধিকার সাত রকম। আর সংবিধানের কর্তব্য হল প্রতি ভারতীয় নাগরীকের মৌল অধিকার রক্ষা করা।"[৬৬]

আর সে কারনেই সুখচাঁদজীকে বলে,

> "তো আমার বকরা বকরি তুলে নিয়ে যায় পুলিশ সুখচাঁদজী ওহি ডোরে অমি ভেগে যাই জঙ্গলে, আমার বকরা বকরি নিয়ে যায় পুলিশ আমিতো কখনো এক টাকাও পাই না? কা সরকার ভুলেগেছে পুলিশকে ঐ মৌল অধিকারের কথা বলতে?

সেটা জুলুম করে ভিক্ষারী।
তবে রাজা সাহেব যে টাকা পেল সুখচাঁদজী শুধু রাজা সাহেব আর বড় মানুষরা পায় ?
বেদনার্ত হেসে সুখচাঁদ বলে, কাজে হয়তো তাই দাঁড়ায় ভিখারী কিন্তু সংবিধানে ভাল কথাই লেখা আছে।”[৬৭]

মহাশ্বেতা এখানে দুসাদ এবং সুখচাঁদের কথোপকথনে পৃথিবীর সবচেয়ে সত্য কথাটিকে প্রকাশ করেন। কেননা খাতায় কলমে সংবিধানে উল্লেখিত কথা সাধারন মানুষের জন্য নয় তা বড়লোক ও মহাজনদের জন্য। যাদের জন্য অফিস, আদালত, পেশাদারী কৌশলীরয়েছে তাদের জন্য। আর সাধারণ মানুষের জন্য রয়েছে ঠিকতার বিপরীত দিকে বিপরীত মুখী শতসহস্র পথ। যা কেবল মাত্র বঞ্চনার এবং শোষণের জন্য। এবং তাই হয়েছে ভিখারী দুসাদের সঙ্গে–সূর্যাস্ত কালে ভিখারির বাসঘরের পাশে একজন পুলিশ ও একজন সিপাহী আসে। তারা দুসাদের কাছে ছাগল দাবি করে কিন্তু দুসাদ দিতে রাজী হয় না। সে বলে,

“এ্যায়সা ন করিও সিপাহী সাহেব গোড় লাগি, গোড় লাগি তোমহারা। অহি হামরা জীও জীবন হায় দেওতা ন লিয়া করো।
ভাগ শালে দুসাদ!
গজানন হাতের চেটো দিয়ে প্রচন্ড চড় মারে ভিখারীর মুখে। নাকের চামড়া ও ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরে। ভিক্ষারী তবুও চেঁচায়, ওহি পুলিশকে ডর সে মরে হাম, ভাগ যাই বাঢ়া, ন লিয়া করো সিপাহীজি, ও পুলিশ ওঠা লেতা বকরি, লেতেহি চলতা। .....
ভিখারী বিপদে উন্মত্ত হয়। বলে, বকরা – বকরি পর হামানি কে ঐসেহি হক্ থে রাজাসাহেব কা, যো জমিন পর ঔর জমিন্ ছিন্ লি যব, উসি হক সে উনকা রূপয়া মিলি। হামকাহে ছোড়ে হামানি কা হক?
কা? কা বোলা দুসাদ?

সিপাহী ও পুলিশ দুটি ভিখারিকে মারে। দক্ষ নিপুন পেশাদারি, প্রশাসন অনুমোদিত মার। মারতে তাদের দম ছোটে না ও মারতে মারতে তারা বলে চলে, কথাগুলো শুনেছ ভাই গজানন, বাটাইদার লোক ওই লড়াই করতে গিয়ে এদের হক–টক শিখিয়েছে। পুলিশ বকরা খাবে না শালা? কোন্ খাবে শুনি? পুলিশ খাবে না? হঁ ভাই গজানন, এ তো আরেক রাজা সাহেব নওয়াগড়ে। রাজা সাহেবের জমিনে হক আর এর বকরায় হক নাকি একই? মেরে ধরে রক্তাক্ত ভিখারিকে ফেলে ওরা ঝাঁপ খোলে। বকরা ও বকরি চাঁরটি নিয়ে চলে যায়।”[৬৮]

পুলিশ এবং সিপাহীর মারের চটে ভিখারি পঙ্গু হয়। বাকি সমস্ত ছাগল বিক্রি করে। বাটি কিনে নিয়ে ভিক্ষা করে এবং জীবন যাপন করে। জমি-জমা, বকরা-বকরি, বাসনপত্র, ঘরবাড়ি প্রভৃতি সম্পত্তি থাকলে পুলিশকে ভয় করতে হয়। জঙ্গলে পালাতে হয়। তাইতো ভিক্ষাবৃত্তিই স্বাভাবিক। কেননা ভিক্ষাবৃত্তিতে এদের কাউকে ভয় পেতে হয় না। জমিদার, মহাজন, পুলিশ, সিপাহী, এদের কারো চোখ ঐ শ্রেণির মানুষের কাছে যায় না।

মহাশ্বেতা ভিখারী দুসাদের মধ্যদিয়ে অবক্ষয়ী সময়কে তুলে ধরেছেন। প্রশাসনের মানুষমারা খেলা, জমিদারের শোষণ রীতি পদ্ধতি, পুলিশি অত্যাচার যে কতটা চরমে উঠেছিল তা বোঝা যায় ভিখারী দুসাদের করুন পরিনতির দ্বারা। দেখা যাবে পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অপরাধের চরম মাত্রাকে। পুলিশ প্রশাসন, সিপাহী প্রভৃতি প্রধানত সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রেই রাখা হয়। কিন্তু এই প্রশাসনের কর্মকর্তারাই সংবিধান বিনষ্টের মূল কুকর্মটি করে থাকেন। পোশাক পরিচ্ছদে সংবিধানের রক্ষক আবার এরাই হয়ে ওঠে সমাজের অন্যতম প্রকৃত ভক্ষক। ভাবতে অবাগ লাগে স্বাধীনতার এত বছর পরেও সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন, জোতদার, জমিদাররা শক্তিমান রাজনীতির মারপ্যাচের জটিলতায় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিরীহ মানুষ গুলোকে শোষণ করে নিচ্ছে। অথচ এদের কোন প্রতিবাদ নেই। সময়ের আবহে যতখানি ঝলকে ওঠে প্রতিবাদের ভাষায় বিদ্রোহে নামার আগেই তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাইতো এদের না আছে প্রতিবাদ, না আছে আন্দোলন, না আছে বাঁচবার কোন উপায়।

আর সে কারনেই মহাশ্বেতা নিজেই প্রতিবাদের দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কলমের ভাষায়। বিদঘুটে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা যেন প্রতিবাদকেই পল্লবিত করেছেন। এই গল্পের একেবারে সমাপ্তিতে,

> "..... কোথায় নেই ভিমাঙা ? কানি ল্যাংড়া দোরারা সব জায়গায় আছে। এখন ভিখারী একতা বড়ো, মস্ত বড় সমাজের সদস্য।
>
> সুখচাঁদ ওরদিকে চেয়ে থাকে। দেখে ভিখারী দুসাদ সাত নম্বর মৌল অধিকারে বঞ্চিত হলেও, তিন নম্বর মৌল অধিকারে সুরক্ষা পেয়েছে। স্বাধীনতার অধিকার, যে কোন বৃত্তি বা জীবিকার অধিকার। ভিখারী ভিখ মাঙ্গার বৃত্তি নিয়েছে। যাতে জন্ম – জন্মকাল ভিখ মাঙ্গাই থেকে যায়, ভারতের সংবিধান তা নিশ্চয় দেখবে। ওকে উন্নতর জীবনে ও জীবিকায় যদি কেউ উত্তরিত করতে চায় ? মৌল অধিকারে সে হস্তক্ষেপ ভারতের সংবিধান সহ্য করবে না। ভারতের যেখানেই সে অন্যায় ঘটুক, ভারতের সংবিধান সেখানে নামিয়ে দিবে পুলিশ, রিজার্ভ পুলিশ, সামরিক পুলিশ, সেনা বিভাগ, ট্যাঙ্ক, জঙ্গি বিমান সব।
>
> ভিখারী দুসাদ পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে পথের মোরে অদৃস্য হয়। এখন আর তার কিছু হারাবার নেই।"[৬৯]

মহাশ্বেতার এই ব্যঙ্গময় বার্তা যেন শুধুমাত্র সমাজ ব্যবস্থাটাকেই নয়,গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক চিত্র টাকেই যেন উলঙ্গ করে দেয়। এই ব্যঙ্গময় আর্তি শুধু বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না তা পরিনত হয় চূড়ান্ত প্রতিবাদে। আর এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই তিনি গ্রামীন জীবনের বহুস্বরিক স্বার্থপরতার বিভিন্ন দিকগুলিকে চিহ্নিত করেন এবং সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষের অসহায়তা ও দূরবস্থাকে তুলে ধরেছেন। শুধু সাহিত্যেই নয় মহাশ্বেতা দেবীর চরিত্র বাস্তব সামাজিক ক্ষেত্রেও একই রকম প্রতিবাদী হয়ে কাজ করে।

যেখানে অন্যায় দেখেন সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রয়োজনে নিজের জীবনের ঝুকি নিতেও কুণ্ঠিত হন না। এ রকম বহু প্রমান রয়েছে। যেমন,অমর মিত্রর নিজের চোখে দেখা মহাশ্বেতার প্রতিবাদী রূপকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'মহাশ্বেতা দি' নামক প্রবন্ধে বলেছেন,

> "সেই সময় ১৯৮০ নাগাত দীঘার সমুদ্র তীরে থাকি একটি হোটেলের ভাড়া ঘরে। গ্রীস্মের ছুটিতে উনি গিয়েছেন। বিকেলে ঘুরছি। হঠাৎ দেখি তিনি দাঁড়িয়ে পরেছেন। কি হল দেখি,
>
> ঘটনা কিছুই না। বিকেলে পথের ধারে কিছু আম নিয়ে বসে ছিল গাঁয়ের একটি লোক। থানার কনস্টেবল বাবু থলে হাতে বাজার করতে বেড়িয়েছেন তখন। তাঁর অধিকারে যা পড়ে, আম ওয়ালার ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে আম তুলে নিচ্ছেন নিজের ব্যাগে। দামটামের বালাই নেই। মহাশ্বেতা দি দাঁড়িয়ে দেখছেন কান্ডটি। গোটা দশেক আম নিয়ে যখন কনস্টেবল বাবু চলে যাচ্ছেন, তিনি ঝপ করে তার হাত ধরে ফেলেছেন, দামটা দাও।
>
> দাম একবার চেয়ে থেমে গিয়ে ছিল ভীত পসারি। মহাশ্বেতা দি কনস্টেবল বাবুরহাত ছাড়ছেন না, বলছেন, থানায় চল, থানায় তোমাকে যেতেই হবে।
>
> সামান্য ঘটনা। কিন্তু মনে গেথে আছে। আম রেখে দিয়ে পুলিশ পালিয়ে ছিল।"[৭০]

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি অন্যতম গল্প হল 'আজীর'। যার মূল অর্থ হল ক্রীতদাস। ক্রীতদাস প্রথার মধ্যদিয়ে জমিদার, জোতদার শ্রেণির মানুষেরা কীভাবে যে ক্রীতদাসের বংশ পরম্পরা অনুযায়ী সমস্ত প্রজন্মকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে সে কাহিনি বর্ণনা করেছেন 'আজীর' গল্পের মধ্যদিয়ে।

যারা আজীর বা ক্রীতদাস, তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বলে কিছু থাকে না। মালিক বা প্রভুর অধীন তারা। আজীরদের না অছে ইচ্ছা না আছে অনিচ্ছা। সারা জীবন মালিকের বাড়িতে কাজ করা আর বিনিময়ে শুধু মাত্র দুবেলা দু মুঠো খাবার খাওয়া এবং বৎসরান্তে দুটো কাপড়। আলোচ্য গল্পের আজীর হলেন পাতন। তার বিয়ের বয়েস উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গ্রামের কোন মানুষই পাতনকে কন্যা দান করে না বিয়ের জন্য। কেননা সে ক্রিতদাস, তাকে মেয়ে দিলে তার সন্তান দেরও আজীর হয়ে থাকতে হবে, কারণ পাতনের পিতৃপুরুষ এই আজীরত্ব বা দাসত্ব স্বীকার করেছে মনিবের কাছে। শুধু পাট্টাতে সই করা হয়েছে তা নয়, রীতিমতো তুলট কাগজে লেখাপড়া হয়েছিল, মহাশ্বেতা সেই তুলোট কাগজে লেখা দলিলের কথা গুলিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন গল্পের মধ্যে,

> "মহা মহিম শ্রীযুক্ত রাবণ শুঁড়ি মহাশয় বরা বরেষু লিখিতং গোলক কুড়া ওলত চেতন কুড়া সাকিনা মৌজে মামুদচক মামুলে পরগণা অযোধ্যা সরকার বাজুহায় কস্য মুনিস্য আজীরি পাট্টা পত্রমিদম কার্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রীগৈরবী নাম্নি দাসি এই দুই জন কহত সালিতে ভবিষ্যত বংশসহসামিল অন্নোপহতী ও কর্জোপহতী ক্রমে নগত পান তিন রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছা পূর্বক বিক্রয় হইলাম – ইতি তাং ১১ই কার্তিক সন ১১০১ বাঙ্গালা মোতাবেক ১৫ সহর রবি রৌয়ন সন ৩৯ জলুস।"[৭১]

নিচে লেখা,

" শ্রীমতি গৈরবী নাম্নি দাসী শ্রী গোলক কুড়া
কস্যা: কস্য:
সন্মতি : ছাপসহি :"

মাত্র তিন টাকার বিনিময়ে আজীর স্বীকার করে পাতনের পিতৃপুরুষ। লিখিত এই দলিলের ভয় দেখিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে আজীর করে রাখে ক্রীতদাসের বংশ পরম্পরা অনুযায়ী আসা সমস্ত বংশধরকে। আর এই করুণ প্রথার শিকার পাতন। মনিবের বাড়িতে থেকে পাতন বুঝতে পেরেছে আর সে কারনেই তার হৃদয়ের খেদোক্তি,

> 'আজীরের কি ঘর আছে? না সংসার আছে? না আলাদা কোন সত্তা? মনিবের ঘর তার ঘর। মনিবের সত্তা তোমারও সত্তা। তোমার দেহটাও তোমার নিজের নয়। প্রান-মন – হৃদয় কিছুই তোমার নিজের নয়।'[৭২]

এরা পালাতে পারে না, পালাতে গিয়ে যদি ধরা পরে তাহলে হাত পা বেঁধে বেদম পিটনি দেওয়া হয় এবং পুনরায় ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। পাতন যে এই রুদ্ধ স্থান থেকে পালানোর চেষ্টা করেনি তা নয়। সে এক বার পালিয়েও ছিল কিন্তু মনিব আবার তাকে ধরেও নিয়ে আসে পুলিশ দিয়ে, এবং পালিয়ে যাবার শাস্তি যা হয় তাই হয়েছে পাতনের সঙ্গে। আর পাতন যখন মুক্তির জন্য মুনিবের হাতে পায়ে ধরে মুক্তির জন্য অনুরোধ করে তাদের সেঁধিয়ে দেওয়া হয় দাস প্রথার আদি অকৃত্রিম গ্যাড়াকলে, 'তুর পিতৃ পুরুষকে মোর পিতৃপুরুষ কিনেছিল, সেকি আমি নিদান করতে পারি? তাল্লে পিতৃপুরুষের ক্রোধ হবে বিষম।'

এই হল তাদের রাজনীতি, প্রথমত ইচ্ছা রাজনীতির প্রয়োগ আর তাতে যদি না বুঝে তো পাট্টার ক্ষমতার প্রয়োগ। এর পরেও যদি কোন ক্রীতদাস না বুঝে তাহলে চলবে চাবুকের ব্যবহার। যেখানে অবুঝ বুঝতে বাধ্য। তার কারনেই ভূবন দাসী তাকে বলে দেয় নিশ্চিত মুক্তির উপায়,'ই দেশ ছেড়ে ভিন দেশ যেতে পারে? ভিনগায়ে? যেখানে ক্যাও তোমারে চিনে না? যিথা গেলে বউ পাও।' কারণ তাদের ইচ্ছা–অনিচ্ছা, ঘর–সংসার নেই, যতদিন কাজ করবে ততদিন ভাতপাবে কাপড় পাবে। আর যখন এই কাজ বন্ধ হবে তখন না খেয়ে থাকতে হবে। তার উপর মনিবের হুকুমের গোলাম হয়েই থাকতে হবে পশু

জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে। শুধু যে এই আজীর রাই পরাধীন তা নয়, সমাজ সংসারে অবস্থিত নিম্নশ্রেণির প্রায় সমস্ত মানুষ এই জীবনই যাপন করে থাকেন। কেননা নিম্নশ্রেণির গরীব হত দরিদ্র মানুষদেরকে এলাকার উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা কুঁয়োর জলটুকু পর্যন্ত নিতে দেয় না। এরাও পুকুরের অশুদ্ধ জল খেয়েই জীবন যাপন করে। রোগে মৃত্যু হলে ভূত, পেত্নী, আত্মার দোষ বলে চালিয়ে যায়। অথচ এদের মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। কোন পশু প্রবৃত্তি নেই কিন্তু জীবন যাপন করে গৃহপালিত পশুর মতোই। তাই মহাশ্বেতা নিজেই যেন ভুবন দাসীর মুখদিয়ে শুনিয়ে দিলেন সমাজ সংসারের বাস্তব ও চির সত্য কথাটিকে,

> "সংসার করা মানে পরনে ত্যানা, স্ত্রী পুরুষে একবেলা ভাত জুটবেনা, যে যখন ক্ষেতে খাটাবে তখন অন্ন পাবে নইলে উপোস, বারো মাস উপোস।
>
> সেই জন্যে সংসার দরকার। স্ত্রী–পরুষের দরকার পরস্পরের গায়ের তাপের। ভাঙাটোপচালের নিচে কঙ্কালের মতো দু চারটে শিশির। নইলে কি নিয়ে থাকে ভুবন দাসের মতো পাতনের মতো মানুষরা?
>
> প্রত্যহ অন্যের আশা কে করে ? ভূবন দাসীরা করে না ওরা জানে এ পৃথিবীতে কিছু মানুষ রোজ খায়, কেউ একবেলা, কেউ মাঝে মধ্যে।
>
> ওরা তৃতীয় দলে। ভাত কে চায়? ভাত কে পায় রোজ? শশীবালা আমানি বেচে, আমানি খাও। শরীরে তাগদ থাকে, বাসরাস্তায় গিয়ে ভাতের হোটেল থেকে ফেন চেয়ে খাও। নইলে জঙ্গলে যাও। জঙ্গল বাবুদের পাহারা এড়িয়ে কন্দখোঁড়, বাঁশের কচিপাতা সেদ্ধ করে খাও।"[৭৩]

মহাশ্বেতা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সমাজ বাস্তবতার চরম ভয়াবহতাকে। প্রকৃত পক্ষে এরা কেউই সুখি নয়। যারা ক্রীতদাস তাদের দুবেলা দুমুঠো অন্য জুটে ঠিকই কিন্তু এদের কোন স্বাধীনতা নেই আর যারা খানিক স্বাধীন ভাবে থাকে তাদের আবার

অন্নবস্ত্রের বিস্তর সমস্যা। প্রকৃত পক্ষে ঐ উচ্চ শ্রেণির মুনিব, মহাজন, জোতদার, জমিদার শ্রেণির মানুষদের জন্যেই যে এদের করুন পরিনতি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা তারা কাউকে হাতে মারে আবার কাউকে ভাতে মারে এবং কাউকে আবার লবনে মারে। প্রকৃত পক্ষে এই মারা মারির খেলা অনবরত চলতে থাকে।

তাইতো পাতনের দু:খের সঙ্গী হয়ে ওঠে মুনিবের স্ত্রী। সে বুঝে পাতনের দু:খ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রনা, কেননা সেও পাতনের মতোই দরিদ্র ঘরের সন্তান শুধু মাত্র দেহগত সৌন্দর্যের কারনেই সে মনিবের তৃতীয় স্ত্রী। পাতন বুঝতে পারে কেননা তাঁর মনিব মা ভরা যুবতি

> ‘দলমলে যৌবন তার। চুল খুলে দিলে হাটুর নিচে পড়ে, চোখ উজ্জ্বল, দাঁত গুলি সাদা ঝকমকে। শরীরের প্রতিটি রেখা নিখুত। সব যেন পাথর কুঁদে তৈরী। বয়সকাল বৃথা গেলে বুঝি যৌবন ঐরকম অচঞ্চল হয়, মাঝে মাঝে চোখ জ্বলে হিংস্রতায়। এখন যেমন জ্বলছে।’[৭৪]

তথাপি পাতন মুনিবের স্ত্রীকে মা বলেই ডাকে। মুনিবের স্ত্রীর হাত, পা, টিপে দেয়, শরীর মালিশ করে দেয়, অজ্ঞান হলে কোলে উঠিয়ে বিছানায় নিয়ে যায়, শুয়ে দেয়, হাওয়া করে দেয় কিন্তু কোনদিন মুনিবের ভরযুবতি সমবয়সী স্ত্রীর দিকে পশু প্রবৃত্তির যৌবিক দৃষ্টিতে তাকায়নি। অপরদিকে মুনিবের বয়সগত কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, সে তার কন্যার বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে নিজের জীবন ও শরীরকে আনন্দময় করে তোলার জন্য। অথচ সেই স্ত্রীকেই জেলখানার কয়েদি করে রাখে। আর সে কারনেই মুনিবের স্ত্রী পাতনকে আর্তনাদ করে বলে,

> ‘মিঞা বাছা কর। তা বাদে তোরে আমি সি পাট্টা চুরি করে লিয়ে দিব! লিয়ে পালাস তু। .....তু জানিস না উ খাল

> ভরার কাছে আমি গোলাম। ই জীবনে মোর মুক্তি লাই। উয়ার ফাঁদ কেটে তু পালালে তাথেও মোর মনে শান্তি তোরে পাট্টাদিব আমি।'[৭৫]

এই মুনিব মাতার দেওয়া সাহসকে বুকে জড়িয়ে ধরেই পাতন ঝড় জলের রাতে বেড়িয়ে পরে মুনিব মাকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু সেই পাট্টার কারনেই পাতন মুনিবের স্ত্রীকে মেরে ফেলে নিজের অজান্তে। কেননা মুনিব মা বলেছে কোন পাট্টা নেই। পাতনের মতো গেয় সাধারণ সাদামাটা যুবক কি করে বুঝবে দুই পুরুষ আগের লেখা তুলট কাগজের পাট্টা গুড়া হয়ে ধুলায় পরিনত হতে পারে। এই পাট্টার ভয় দেখিয়েই তাদের জন্ম জন্ম ধরে আজীর করে রাখা হয়। চেতনার অসারতা দিয়ে জীবনের সহজতাকে গ্রহন করার পক্ষেও যে এ মানুষ গুলো ব্রাত্য। তাইতো সন্দেহের বশে নিজেকেই হত্যার আসামী করে তোলে। এ জীবন এগিয়ে এলেও এরা তার ইশারা বুঝতে পারেনা।পাতন পিতৃপুরুষের চুক্তি এবং ধর্মিয় বিশ্বাসকে গায়ে কালো ছাই ঢেলে দিয়েই পালিয়ে গেছে। এবং মুনিব মা তার সমস্ত রাজ ঐশর্য্য সমাজ কূল, ধর্ম, জমিদারি, টাকা পয়সা, সোনা দানা, ঘর বাড়ি, সমস্ত মায়া মমতাকে বিসর্জন দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে রাতের অন্ধকারে পাতনের হাত ধরে। এবং সমস্ত লজ্জা, ঘৃনা, ত্যাগ করে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে কাপড়ে বলতে পেড়েছে,

> "মোর মতো দলমলে মিঞা তু পাবি কুথা পাতন? মোরা চলে যাব, যেয়ে যেথা হয় থাকব। চল পাতন, জঙ্গল পেরায়ে আরও পথ, তা বাদে বাসরাস্তা, তাবাদে টিসন। টেনে যাব মোরা।"[৭৬]

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী আজীর গল্পের মধ্য দিয়ে আজীর বা ক্রীতদাসের দাসত্বের জটিলতর জীবন-যাপন পদ্ধতিকে যেমন তুলে ধরেছেন অপর দিকে নারীর জীবনের উপেক্ষার, অবজ্ঞার বঞ্চিত ব্যথা বেদনা ও প্রতিবাদকে পর্যালোচনা করেছেন।

তথ্যসুত্র

১. ‘বর্ষাযাপন’, ‘সোনারতরী’, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিবাগ।

২. সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, সম্পা- হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ গোপাল রায় , বঙ্গীয় সংসদ, কোলকাতা, পৃ-৯৬৫

৩. তদেব-৯৬৪

৪. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, পৃ-৫৮০

৫. সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, সম্পা-হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, পৃ-৯৬৬

৬. মায়াবি নিষাদ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, পৃ-১৯৬৯

৭. অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের শতদল এর ভূমিকা, ডিসেম্বর, ১৯৬৫

৮. সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, সম্পা- হিরেন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, পৃ-৯৬৬

৯. বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরন, বীরেন্দ্র দত্ত, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, পৃ-৫৯১

১০. ছোটগল্পের বিষয় আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, পৃ-৬৯

১১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, কোলকাতা, পৃ-১১০৭

১২. কালের পুত্তলিকা ছোটগল্পের একশ দশ বছর, অরুন কুমার চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ-৩৯৫

১৩. তদেব, পৃ-৩৯৬

১৪. শোভন রায়ের নিবন্ধ,'ছোটগল্প ও ভাষা' ক্রান্তিক, সংকলন, শ্রাবন-১৯৬৮

১৫. মহাশ্বেতা শ্রেষ্ঠগল্প, ভূমিকাংশ, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ-১০-১১

১৬. প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক, কোলকাতা, পৃ-১০৫

১৭. তদেব, পৃ-১০৫

১৮. তদেব, পৃ-১০৫

১৯. নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনি, ঢাকা, পৃ-২৪

২০. তদেব, পৃ-২৪

২১. তদেব, পৃ-২৪

২২. তদেব, পৃ-২৪

২৩. তদেব, পৃ-২৪

২৪. মহাশ্বেতা নারীপরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, পৃ-১৩

২৫. নারীর মূল্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৬৪, পৃ-৩৯/৪০

২৬. মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও আন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, পৃ-১৩

২৭. নারী, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, পৃ-২৫

২৮. শরৎচন্দ্র চট্টো:, নারীর মূল্য, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৬৪, পৃ-৪৫-৪৬

২৯. মহাশ্বেতা দেবী, অমৃতলোক, বিশেষ সংখ্যা-১০৩, পৃ-১৪১

৩০. প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক, কোলকাতা, পৃ-১০৬

৩১. নারীর কথা, আবুল হাসনাত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ-৯

৩২. প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক, মেদিনীপুর, পৃ-১২১

৩৩. কোরক মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, সম্পা:তাপস ভৌমিক, জানুয়ারী-২০০৩, পৃ-২৯

৩৪. বিশ শতক, পত্রিকা, ১ম জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃ-২৭

৩৫. এম ডব্লু বনাম লখিন্দ, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৮ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ-৪৩৭

৩৬. মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র, ২য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ভূমিকাংশ, পৃ-৭

৩৭. তদেব, পৃ-৯৭

৩৮. তদেব, পৃ-৯৯

৩৯. তদেব, পৃ-১০৮

৪০. তদেব, পৃ-১২৭

৪১. তদেব, পৃ-১৪১

৪২. তদেব, পৃ-১৬১

৪৩. তদেব, পৃ-১৭৭

৪৪. তদেব, পৃ- ১৪৫

৪৫. তদেব, পৃ-১৯১

৪৬. তদেব, পৃ-১৯৮

৪৭. তদেব, পৃ-২০৫

৪৮. তদেব, পৃ-২০৬

৪৯. মহাশ্বেতার গল্প মহাশ্বেতার সন্ধানে, উৎপল মন্ডল, কামনা মজুনদার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা, পৃ-১৩

৫০. শ্রেষ্ঠগল্প, মহাশ্বেতা দেবী, ভূমিকার পরিবর্তে, সম্পা- আজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং,

কোলকাতা, পৃ-১০

৫১. তদেব, পৃ-৯

৫২. 'মহাশ্বেতার আখ্যান বিশ্ব : ইতিহাসের মনন', সম্পাদক: সমীরন মজুমদার, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা-১০৩, পৃ-১২-১৩

৫৩. শ্রেষ্ঠগল্প, মহাশ্বেতা দেবী, সম্পা- অজয় গুপ্ত, ভূমিকাংশ, পৃ-১০

৫৪. ছায়াদর্পনে মহাশ্বেতা, কনিকা বিশ্বাস, এবং মুশায়েরা, অক্টোবর-২০০১, পৃ-১১৪/১১৫

৫৫. 'মহাশ্বেতার আখ্যান বিশ্ব : ইতিহাসের মনন', সম্পাদক: সমীরন মজুমদার, তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা-১০৩, পৃ-১৩

৫৬. মহাশ্বেতা নারীপরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কোলকাতা,

৫৭. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র, ৫ম খন্ড, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ-৪৭২

৫৮. তদেব, পৃ-৪৭২

৫৯. তদেব, পৃ-৪৭৭

৬০. তদেব, পৃ-৪৭৭

৬১. তদেব, পৃ-৪৯০

৬২. তদেব, পৃ-৪৯৯

৬৩. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহার রঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ-৪২৫

৬৪. মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, নির্মল ঘোষ, করুনা প্রকাশন, কোলকাতা,

পৃ-১২

৬৫. শ্রেষ্ঠগল্প মহাশ্বেতা দেবী, অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা পৃ-১৩১

৬৬. তদেব, পৃ-১৩৮

৬৭. তদেব, পৃ-১৪০

৬৮. তদেব, পৃ-১৪২/১৪৩

৬৯. তদেব, পৃ-১৪৫

৭০. গল্পসরণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক: অমর দে, ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন- ১৪১৮, গল্পসরণি, পৃ-১১৬-১১৭

৭১. মহাশ্বেতা রচনা সমগ্র ৯ম খন্ড, সম্পা- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা পৃ-৪৮৭

৭২. তদেব, পৃ-৪৮৯

৭৩. তদেব, পৃ-৪৮৩

৭৪. তদেব, পৃ-৪৯০

৭৫. তদেব, পৃ-৪৯১

৭৬. তদেব, পৃ-৪৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

মহাশ্বেতার ছোটগল্পে স্বর ও স্বরান্তর,প্রতিনিধি স্থানীয় পাঠকৃতি, বিষয়বস্তু ও সময়গত বর্গীকরণ।